BanglaBook.org

বিশ্বের সেরা কল্পবিজ্ঞান

অমিত চক্রবর্তী

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

BISWER SERA KALPOBIJNAN

(An Anthology of English and Russian Science Fiction)

Translated & Edited by

Dr. Amit Chakraborty

First Published
January, 1999

ISBN 81-7332-254-3

Price
Rs. 45/- Only.

প্রথম প্রকাশ
বইমেলা, ১৯৯৯

দাম : ৪৫ টাকা

পুনশ্চ, ১১৪এন, ডাঃ এস. সি. ব্যানার্জী রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১০ থেকে সন্দীপ নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত এবং ডটলাইন প্রিন্ট অ্যান্ড প্রসেস, ১১৪এন, ডাঃ এস. সি. ব্যানার্জী রোড, কলকাতা ৭০০ ০১০ থেকে মুদ্রিত।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

মুখবন্ধ

কল্পবিজ্ঞান বা সায়েন্স ফিকশন শুধুই ফ্যান্টাসি বা কল্পনা নয়—বিজ্ঞানের মাল-মশলাও তাতে থাকাটা জরুরি। কল্পবিজ্ঞানের জন্ম রূপকথার মধ্যে। রূপকথার লেখকরা কোনো একসময় বিজ্ঞানের আলোয় নতুন করে রূপকথা লেখার তাগিদ অনুভব করেছিলেন। এটা সেই সময়ের কথা, যখন বিজ্ঞান পাল্টাতে শুরু করেছে সমাজ, সভ্যতা আর সংস্কারকে। সাধারণ মানুষের মনে জাগছে ভয়-মেশানো কৌতূহল—এরপর কী হবে। এই কৌতূহলের সঙ্গে ছিল অজানা আর উদ্ভট জিনিসগুলিকে বিজ্ঞানের আলোয় যুক্তিগ্রাহ্য করে তোলার প্রয়াস। এই দুই-এর পরিণতি—কল্পবিজ্ঞান। কল্পনা ছুটল, তবে এবার আর বনবাদাড়ে এবড়ো-খেবড়ো পথে নয়; বিজ্ঞানের চওড়া বাঁধানো সড়ক ধরে।

পৃথিবীর প্রথম কল্পবিজ্ঞান কোনটি তা নিয়ে মতভেদ আছে। কল্পবিজ্ঞান নিয়ে সমীক্ষা-মূলক বই—'নিউ ম্যাপস অফ হেল'-এর লেখক কিঙ্গলে অ্যামিস গ্রিক সাহিত্যিক 'লুসিয়ান অফ সামাসোটা'র লেখা 'স্ট-হিসট্রি'কে প্রথম কল্পবিজ্ঞান আখ্যা দিয়েছেন। কারণ এতে ছিল গ্রহান্তর যাত্রার বর্ণনা, যদিও সেগুলো বিজ্ঞানের আলোয় যুক্তিগ্রাহ্য নয়। এভাবে দেখলে, আমাদের রামায়ণ মহাভারতেও কল্পবিজ্ঞানের মালমশলা মেলে। মহাকাশ বিজ্ঞানী জোহান কেপলারের লেখা 'সোমনিয়ার' —যাঁর বিষয়বস্তু ছিল চন্দ্রাভিযান, তা অনেক বেশি বিজ্ঞাননির্ভর। পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরে বিশ্বসাহিত্যে গ্রহান্তর আর পৃথিবীর অজানা প্রান্তের অদ্ভুত মানুষ আর জন্তু জানোয়ারদের অজস্র কল্পকাহিনীর ভিড়! এদের মধ্যে 'গালিভার্স ট্রাভেলস'-এর সঙ্গে আমরা সবচেয়ে বেশি পরিচিত।

কল্পবিজ্ঞানের এগিয়ে যাওয়ার পথে প্রথম ব্যতিক্রম মেরি শেলি'র লেখা 'ফ্রাঙ্কেনস্টাইন'। এরপর কল্পবিজ্ঞানের জগতে এলেন এইচ জি ওয়েলস। এ শতাব্দীর গোড়ায় আমরা পেলাম ফরাসি গল্পকার জুল ভের্ন কে। কল্পবিজ্ঞানকে গোটা দুনিয়ার পাঠকমহলের কাছে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে এই দুজনের অবদান অনেকখানি।

আমাদের দেশের পাঠকমহলের সঙ্গে জুল ভের্নের পরবর্তীযুগের লেখকদের লেখা কল্পবিজ্ঞানের তেমন পরিচয় ঘটেনি। এইচ জি ওয়েলস এবং আলেকজান্দর বেলিয়ায়েভ ছাড়া যাঁদের গল্প এই সঙ্কলনে স্থান পেয়েছে তাঁদের অধিকাংশেরই লেখালেখি এ শতাব্দীর পাঁচের দশক বা তার পরে। এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কল্পবিজ্ঞানের গল্পকার হিসেবে যে দুজন খ্যাতির সর্বোচ্চ চূড়ায় উঠেছেন সেই আইজ্যাক অ্যাসিমভ এবং আর্থার সি ক্লার্ক-এর দুটি করে গল্প এই সঙ্কলনে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। যেসব গল্প এই বই-এ স্থান পেয়েছে সেগুলো মূল গল্পের হুবহু অনুবাদ নয়। পরিশেষে জানাই—ইংরেজি এবং রুশ ভাষা ছাড়া অন্যান্য ভাষায় লেখা কল্পবিজ্ঞানকে এই বই-এর আওতায় আনা গেল না।

জানুয়ারি, ১৯৯৯ — অমিত চক্রবর্তী

কলকাতা বইমেলা

সূচি

গল্প	গল্পকার	পৃষ্ঠাঙ্ক
চুরি যাওয়া জীবাণু	এইচ জি ওয়েলস	৯
অদেখা আলো	আলেকজান্দর বেলিয়ায়েভ	১৪
মৃত্যুঘর	হারমান ম্যাক্সিমভ	২২
সেই নীল বোতলটা	রে ব্রাডবারি	৩১
গাধা	আইজ্যাক অ্যাসিমভ	৩৬
বাবার স্ট্যাচু	আইজ্যাক অ্যাসিমভ	৪০
ক্রীতদাস	গ্লেব অ্যানফিলভ	৪৬
সবুজ মানুষ	ক্লিফোর্ড সিম্যাক	৫১
অভিযাত্রী	ভ্যালেন্টিনা ঝুরাভলেভা	৬০
বড়দিনের তারা	আর্থার সি ক্লার্ক	৬৯
ঈশ্বরের নাম	আর্থার সি ক্লার্ক	৭৫
জঞ্জাল	ভ্লাদিমির গ্রিগরিয়েভ	৮২
মতামত	ফ্রেডারিক পল ও সি এম কর্নব্লাথ	৯১
শুধু একজন	ইগর রসোখোভাৎস্কি	৯৯
পরীক্ষার দিন	হেনরি স্লেসার	১০৪
আজব ডিম	বিল ব্রাউন	১০৯
গুটি	ডিন কুনজ	১১৭
ছদ্মবেশ	আব্রাম ডেভিডসন	১২২
ছোট্ট মেয়ে অ্যান	উর্মুলা কে লেগুইন	১২৮
খুদে উদ্যোগ	উইলিয়াম লি	১৩৫

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

চুরি যাওয়া জীবাণু

এইচ জি ওয়েলস

কাচের স্লাইডটাকে মাইক্রোস্কোপের নিচে রেখে প্রফেসর বললেন, 'কলেরার মতো ভয়াবহ জীবাণু যদি দেখতে চাও তো, এখানে এসো।'

যার উদ্দেশ্যে বলা, সেই ফ্যাকাসে চেহারার যুবকটি বেশ নার্ভাস বোধ করছিল। ওকে দেখেই বোঝা যায়, জন্মে কখনোও কোনো ল্যাবরেটরিতে ঢোকেনি এবং মাইক্রোস্কোপ দেখেনি। প্রফেসরের বেশ মজাই লাগছিল। সাধারণত ওঁর মতো নামজাদা জীবাণু-বিশেষজ্ঞের কাছে এ জাতীয় ছেলেরা আসে না।

'কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না।' মাইক্রোস্কোপ থেকে চোখটা সরিয়ে নিয়ে ছেলেটি বলল—

'নিশ্চয়ই ফোকাস থেকে সরে গেছে; ওই স্ক্রুটা সামান্য ঘোরাও। এবারে দেখতে পাচ্ছ?'

'হ্যাঁ, পেয়েছি।' ছেলেটি সায় দেওয়ার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে। 'কতগুলো গোলাপী রঙের সুতোর মতন দেখাচ্ছে; আপনি বলছেন, ওগুলোই কলেরার জীবাণু? নিজেদের সংখ্যা অস্বাভাবিক বাড়িয়ে তুলে এগুলোই একটা গোটা শহরকে উজাড় করে দিতে পারে? আশ্চর্য!'

কাচের স্লাইডটা হাতে ধরে মাইক্রোস্কোপের কাছ থেকে সরে আসে ছেলেটি। প্রফেসরের দিকে ওটা এগিয়ে দিয়ে বলে, 'বিশ্বাস হয় না—এই খুদে জীবগুলো এতটা ভয়ঙ্কর! আচ্ছা, এগুলো কি জীবিত?'

'উঁহু, ওগুলোকে মেরে ফেলা হয়েছে। আমার তো ইচ্ছে করে, এগুলোর মতোই দুনিয়ার যাবতীয় রোগ জীবাণুকে মেরে ফেলি।'

'আপনারা কি শুধু মৃত জীবাণু নিয়েই গবেষণা করেন?'

'তা কেন? জীবিত ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস নিয়েও কাজ করতে হয়।' বলেই প্রফেসর ঘরের একপাশে রাখা কাচের আলমারির দিকে এগিয়ে যান। তারপর একটা মুখ আঁটা কাচের ছোট শিশি হাতে নিয়ে বলেন, 'এই যে এর মধ্যে জলের মতো জিনিসটা দেখছ—এর ভেতরে জীবিত রোগজীবাণু কিলবিল করছে। খালি চোখে অবশ্য কিছু বুঝবে না।'

BanglaBook.org

'এগুলোও কি কলেরার জীবাণু?'

ছেলেটির রক্তশূন্য মুখের দিকে তাকান প্রফেসর। খানিক আগেই ওঁর এক বন্ধুর চিঠি নিয়ে যখন দেখা করল, প্রথমটায় বিরক্তই হয়েছিলেন। ছুটির দিনে লাঞ্চের পর বাড়ির ল্যাবরেটরি-ঘরের এক কোণে আরাম কেদারায় শুয়ে বই পড়তে ভালোবাসেন। সেইসময় হঠাৎ করে অপরিচিত কারোর এসে পড়াটা পছন্দ না করারই কথা। পরে যখন শুনলেন, ছেলেটি ওঁর গবেষণার বিষয়টা নিয়ে কাগজে লিখতে চায় তখন স্বাভাবিকভাবেই বিরক্তিটা চলে গেছে। তাছাড়া. ছেলেটি বিজ্ঞানের ব্যাপার-স্যাপার না বুঝলেও, জানার আগ্রহ আছে। ওর দৃষ্টিতে ভয়, বিস্ময় আর কৌতূহল মিলেমিশে ছিল। তা দেখে, বেশ মজাই লাগছিল প্রফেসরের।

'হ্যাঁ। সত্যি বললে, মহামারি রোগকে বোতলবন্দি করে রাখা আছে এখানে। যদি এইরকম একটা শিশিকে ভেঙে ফেলে দাও পানীয় জলের রিজার্ভারে, তবে আর দেখতে হবে না! মৃত্যুর ছায়া নেমে আসবে গোটা শহরের ওপর। এই অসুখ স্ত্রীর কাছ থেকে স্বামীকে কেড়ে নেবে, শিশুকে ছিনিয়ে নেবে মায়ের কোল থেকে! শুধু পানীয় জলই বলি কেন, মাটিতে পড়লেও এইসব মৃত্যুদূতের হাত থেকে রেহাই নেই। মাটির নিচে সঞ্চিত জলে গিয়ে একবার মিশলেই হল— যেখানে যত কুয়ো আছে, সেগুলোর জলকে সংক্রামিত করবে! তখন কি আর মহামারীকে আটকানো সম্ভব?'

ছেলেটি নিবিষ্টমনে প্রফেসরের কথাগুলো যেন গোগ্রাসে গিলছিল। উনি থামতেই হঠাৎ বিড়বিড় করে বলে উঠল, 'সত্যি কী বোকা আমরা! এ জিনিস থাকতে বোমা বানানোর দরকার কী?'

ভেতরের দরজায় আঙুলের টোকার শব্দ কানে এল প্রফেসরের। নিশ্চয়ই স্ত্রী কিছু বলবে। 'এক মিনিট, আসছি'—বলেই ছেলেটিকে বসিয়ে রেখে বাড়ির ভেতরে গেলেন।

ল্যাবরেটরি-ঘরে ফিরে আসতে কয়েক মিনিট সময় লাগল। প্রফেসর দেখলেন, ছেলেটি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। উনি ঘরে ঢুকতেই বলল, 'আজ আপনার প্রায় এক ঘণ্টা সময় নিয়ে নিয়েছি। এখন চারটে বাজতে বারো মিনিট বাকি; আমার সাড়ে তিনটেয় ওঠা উচিত ছিল। ঠিক চারটের সময় একজনের সঙ্গে দেখা করার কথা।'

মাথা ঝুঁকিয়ে প্রফেসরকে ধন্যবাদ জানাতে জানাতে বাইরের দরজার দিকে এগোল ছেলেটি। প্রফেসরও সঙ্গে এলেন। ছেলেটি বেরিয়ে যেতেই সদর দরজা বন্ধ করে ল্যাবরেটরি-ঘরে ফিরে এলেন। রিপোর্টার ছোকরার হঠাৎ এমন হন্তদন্ত

BanglaBook.org

হয়ে বেরিয়ে যাওয়াটা মোটেই যেন স্বাভাবিক লাগছিল না। ছেলেটা সত্যি সত্যিই সাংবাদিক, নাকি অন্য কোনোও মতলবে এসেছিল—সেটাই ভাবতে ভাবতে ল্যাবরেটরি-ঘরের টেবিলের দিকে এগোতে গিয়েই চমকে উঠলেন প্রফেসর। কাচের শিশি উধাও। অথচ ঠিক মনে আছে, ভেতরের ঘরে যাওয়ার আগে শিশিটা ওই টেবিলের ওপরেই রেখেছিলেন।

'মিনি, এক্ষুনি একবার এসো।' স্ত্রীকে চিৎকার করে ডাকলেন।

'কী ব্যাপার?' পাশের ঘর থেকে স্ত্রীর গলা শোনা গেল।

'একটু আগে যখন ঘরের ভেতরে তোমার সঙ্গে কথা বলছিলাম, তখন কি আমার হাতে কোনো শিশি ধরা ছিল।'

''না তো।'

'সর্বনাশ হয়েছে!' বলেই সদর দরজার দিকে ছোটেন প্রফেসর।

স্ত্রী ঘরে ঢোকার আগেই পাজামা আর রবারের চটি পরা অবস্থাতেই রাস্তায় নেমে পড়েন। বাড়ির সামনেই ঘোড়ার গাড়ির কোচোয়ানদের জটলা। একটু আগেই রোগা ফ্যাকাসে কোনো ছোকরাকে বাড়ি থেকে হন্তদন্ত হয়ে বেরোতে দেখেছে কিনা জিজ্ঞাসা করতেই একজন আঙুল দিয়ে খানিক দূরের একট গাড়ি দেখিয়ে দেয়। দূর থেকেও গাড়ির ভেতরে বসে থাকা ছেলেটিকে চিনতে ভুল হয় না প্রফেসরের। সঙ্গে সঙ্গে তিনিও উঠে পড়েন সামনের একটা ফাঁকা গাড়িতে। কোচোয়ানকে বলেন, 'যেভাবেই হোক, সামনের ওই গাড়িটাকে ধরা চাই।'

খোলা দরজার কাছে এসে প্রফেসরকে ঘোড়ার গাড়িতে উঠতে দেখেন প্রফেসর-গিন্নি। স্বামী একজন বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞানী মাত্রেই একটু খ্যাপাটে গোছের হয়ে থাকে—কিন্তু তাই বলে লন্ডন শহরে এই শেষ-বিকেলের ঠান্ডায় কোনো সম্ভ্রান্ত লোক খালি পায়ে এবং ঘরের পোশাকে রাস্তায় ঘুরবে—এটা মেনে নেওয়া কষ্টকর। তাছাড়া ঠান্ডা লাগার আশঙ্কাও কিছু কম নয়। সুতরাং মিনিট দুয়েকের মধ্যে স্বামীর ওভারকোটটা হাতে নিয়ে তিনিও বেরিয়ে আসেন রাস্তায় এবং সামনে যে গাড়িটা পান তাতে উঠে পড়ে প্রফেসরের গাড়িকে অনুসরণ করার নির্দেশ দেন।

শহরের রাস্তায় এমন দৃশ্য সচরাচর দেখা যায় না। ঝড়ের বেগে ছুটে চলেছে তিন-তিনটে ঘোড়ার গাড়ি। কে আগে পৌঁছোবে তার যেন প্রতিযোগিতা চলছে। রাস্তার দুপাশে ভিড় জমতে দেরি হয় না। হাততালি দিয়ে, আওয়াজ করে তারা উৎসাহ দিতে থাকে কোচোয়ানদের।

প্রথম গাড়িতে বসে থাকা ছেলেটির চোখে মুখে উল্লাস আর ভয় মিলেমিশে

BanglaBook.org

রয়েছে। হাতের মুঠিতে ধরা শিশিটায় রয়েছে মারাত্মক অস্ত্র যা দিয়ে অনায়াসে ধ্বংস করা যায় গোটা শহরটাকে। এত সহজে যে ব্যাপারটা ঘটবে তা নিজেও কখনোও ভাবেনি। এর জন্য অবশ্য ওকে পাকা অভিনেতার মতো কথাবার্তা চালাতে হয়েছে; ভান করতে হয়েছে, যেন সত্যিসত্যিই জীবাণু সম্পর্কে কতই না আগ্রহ ওর! প্রফেসর লোকটি ব্যাকটেরিয়া-জীবাণু নিয়ে গবেষণা করেন সেটা জানা ছিল, কিন্তু তাই বলে কলেরার মতো ভয়ঙ্কর রোগের জীবাণু এমনভাবে হাতের মুঠোয় চলে আসবে তা একেবারে অকল্পনীয়। অ্যাদ্দিনে ওর সুযোগ এসেছে সারা দুনিয়াকে ওর ক্ষমতা দেখানোর। এতদিন ধরে যারা ওকে নিষ্কর্মা বলে অবজ্ঞা করেছে, খ্যাপাটে-পাগল বলে ঠাট্টা করেছে, ওকে মানুষ বলেই মনে করেনি—তাদের সবাইকে ও চরম শিক্ষা দিয়ে যাবে। এখন শুধু একটাই কাজ বাকি। লন্ডনের যে বড় জলাধার থেকে পাইপে করে জল পাঠানো হয় শহরের সমস্ত বাড়িতে, মুখটা খুলে নিয়ে তার মধ্যে শিশিটাকে ফেলে দেওয়া। তাহলেই ওর এতদিনের পরিকল্পনা সার্থক হবে।

পেছনে যে আর একটা গাড়ি তাকে ধরার জন্য ছুটে আসছে, কোচোয়ানেরই তা প্রথম নজরে এল। তার কথায় পেছনে ঘাড় ঘুরিয়ে প্রফেসরকে দেখতে পেল ছেলেটি। 'বুড়োটা আবার পিছু নিয়েছে দেখছি'—বলেই পকেট থেকে একটা কড়কড়ে নোট বের করে কোচোয়ানের দিকে এগিয়ে দিতেই কাজ হল। প্রচণ্ড জোরে চাবুক হাঁকড়াতেই ঘোড়াটার ছোটার গতি একটু বাড়ল। প্রফেসরের গাড়ি ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে দেখে ছেলেটি যখন স্বস্তি পেতে শুরু করেছে তখনই ঘটল বিপত্তি। রাস্তার গর্তে হঠাৎ বেকায়দায় পড়তেই গাড়িটা ঝনাৎ করে কেঁপে উঠল। আর অমনি হাতে ধরা শিশিটা ছিটকে গিয়ে গাড়ির মেঝেয় পড়ে ভেঙে গেল। কাচের শিশি থেকে বেরিয়ে আসা তরল জিনিসটা শুষে নিতে শুকনো কাঠের সময় লাগল না। মুহূর্তের বিহ্বলতা কাটিয়ে ভাঙা শিশিটাকে হাতে তুলে নিতে, তার ভেতরে অবশিষ্ট কয়েক ফোঁটা তরল নজরে এল ছেলেটির।

প্রচণ্ড ঝাঁকুনির সঙ্গে সঙ্গেই ঘোড়ার রাশ টেনে ধরেছিল কোচোয়ান। প্রফেসরের গাড়িটা যখন পাশে এসে দাঁড়াল তখনও হতভম্বের মতন হাতে ধরা ভাঙা শিশির দিকে তাকিয়ে বসেছিল ছেলেটি। প্রফেসরের চিৎকারে সম্বিত ফিরল। এক মুহূর্ত দেরি না করে কাচের শিশির অবশিষ্ট দু-তিন ফোঁটা তরল নিজের গলার মধ্যে ঢেলে দিল ছেলেটি। তারপর হাত নেড়ে নাটকীয় কায়দায় বলল, 'দেরি করে ফেলেছেন স্যার। আপনার ওই মারাত্মক জীবাণু এখন আমার শরীরের মধ্যে চলে গেছে। আমার থেকে এটা যাবে আরও হাজার হাজার লোকের মধ্যে। আমি তো মরবই, কিন্তু আপনারাও কেউ নিস্তার পাবেন না।'

BanglaBook.org

উন্মাদের দৃষ্টি চিনতে ভুল হল না প্রফেসরের। কী মনে করে গাড়ি থেকে নামতে গিয়েও আর নামলেন না। ততক্ষণে প্রফেসর-গিন্নিও এসে পড়েছেন। তাঁকে ইশারায় ডেকে নিজের গাড়িতে তুলে নিলেন প্রফেসর। ওভারকোটটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে কোচোয়ানকে বাড়ি ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। ততক্ষণে ছেলেটি রাস্তা দিয়ে হাঁটতে শুরু করেছে। প্রফেসর দেখলেন, ইচ্ছে করেই পথচারীদের গা-ঘেঁষে এগিয়ে চলেছে ছোকরা। স্ত্রীকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, 'আশ্চর্য, ছেলেটা যে বদ্ধ উন্মাদ—তখন একেবারেই বুঝতে পারিনি!'

বাড়ি ফিরতে ফিরতে সমস্ত ঘটনাটা স্ত্রীকে শোনানোর পর মুচকি হেসে বললেন, 'ছেলেটি যখন জানতে চাইল, শিশির মধ্যে কলেরার জ্যান্ত জীবাণু রয়েছে কিনা, ওকে ভয় পাওয়াতেই বলে দিলাম —'হ্যাঁ'। ছেলেটি যে ওটা নিয়ে পালাবে তা ঘুণাক্ষরে মাথায় আসেনি।'

'কী ছিল ওতে?'

'নতুন এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া নিয়ে কালচার করছিলাম কদিন ধরে। তারই একটা নমুনা ছিল ওতে।'

'কোন অসুখের জীবাণু ওটা?'

তা ঠিক এখনও জানি না। তবে কয়েকটা গিনিপিগ আর একটা বেড়ালছানার গায়ে ওটা ঢোকাতেই ওদের গায়ে নীল রঙের ছোপ ধরে গিয়েছিল, সেটা দেখেছি। ব্যাকটেরিয়াগুলো পেটে যাওয়ার পর ওই ছোকরার গায়ের রঙটা কেমন দাঁড়ায়, সেটা দেখার কৌতূহল হচ্ছে, বুঝলে?—বলেই জোরে জোরে হেসে ওঠেন প্রফেসর।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অদেখা আলো

আলেকজান্দর বেলিয়ায়েভ

'আমাদের এই ডাক্তার সাহেব ভালোই রোজগার করে থাকেন—কী বলেন?' ডাক্তার ভিরোভালের লোকভর্তি চেম্বারের এক কোণে বসে থাকা মানুষটি পাশের লোকটির দিকে চেয়ে প্রায় ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করেন।

'তা সত্যি,' পাশের মানুষটি জবাব দেন, 'এমনকি ওঁর ঐশ্বর্য অন্ধদেরও চোখ এড়ায় না!'

'আমি যে অন্ধ, তা আপনি জানলেন কী করে?'

'আপনার চোখের মণি দুটোর রং আকর্ষণীয় হলেও ওদের মধ্যে প্রাণের চিহ্ন নেই। তাছাড়া আপনার চোখের সামনে আমি বারকয়েক হাতটাকে এদিক ওদিক সরিয়েছি, আপনি বুঝতেই পারেননি। আপনার চোখের পাতা একবারের জন্যেও কাঁপেনি।'

'আজ্ঞে, আপনি ঠিকই ধরেছেন।' অন্ধ মানুষটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে ওঠেন। 'চোখে দেখতে না পেলেও, আমার অন্য সব অনুভূতি দিয়ে ডাক্তার ভিরোভালের ঐশ্বর্য টের পেয়েছি। ধরুন কিনা, শহরের সবচেয়ে দামি জায়গায় ডাক্তারের চেম্বার, বাড়িতে ঢোকার মুখে অনেকটা জায়গা জুড়ে গোলাপের গন্ধ আর দারোয়ানের হাঁকডাক। এখানে এই ঘরের ভেতর নরম গদি আঁটা সোফা, রুগীদের নাম লিখে নেওয়ার জন্য মহিলা সেক্রেটারি—এসব থেকে ডাক্তারের আর্থিক অবস্থাটা বুঝতে কি অসুবিধে হয়?'

'রুগীদের কাছ থেকে মোটা ভিজিট আদায় করতে হলে এসব ভড়ং দেখাতেই হয়।' প্রায় যেন স্বগতোক্তি করেন পাশের লোকটি। চারপাশে অপেক্ষারত রুগীদের ওপর চট করে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলেন, 'আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে অল্প কদিন আগেই আপনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন। আপনি যে জন্মান্ধ নন, আপনার হাবভাবে তা দিব্যি বোঝা যায়। কী হয়েছিল বলুন তো। কোনো অসুখ-টসুখ?'

'উঁহু, অসুখ-টসুখ নয়। আমি আসলে একজন ইলেকট্রিশিয়ান। কাজ করতাম ইউনিভার্সাল ইলেকট্রিক কোম্পানিতে। ওখানেই একদিন আল্ট্রাভায়োলেট ল্যাম্প নিয়ে কাজ করার সময়...'

BanglaBook.org

'বাকিটা আর বলতে হবে না।' অন্ধ রুগীটিকে মাঝপথেই থামিয়ে দেন পাশের লোকটি। 'তা, আপনাকে এখানে আমার বুদ্ধিটা কে দিল জানতে পারি কি? আপনি ভেবেছেন, এই ডাক্তার আপনার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেবে? আরে মশাই, একেবারে চশমখোর লোক যাকে বলে! যতক্ষণ আপনার পকেট না পুরোপুরি খালি হয়ে যায়—আপনাকে ক্রমাগত স্তোক দিয়ে যাবে.........'

'আপনি আমাকে যতটা বোকা ভাবছেন, আমি ঠিক ততটা বোকা নই।' ধীর কণ্ঠে বলে ওঠেন অন্ধ মানুষটি। 'বেশ বুঝতে পারছি, আপনি আসলে অন্য কোনো ডাক্তারের এজেন্ট। এখান থেকে রুগী ভাগিয়ে নিয়ে যাওয়াই আপনার কাজ!'

'আপনি ঠিকই ধরেছেন। আমি অন্য একজন ডাক্তারের এজেন্ট। আমার নাম ক্রুস।' হাল্কা গলায় উত্তর আসে।

'আর আপনার ডাক্তারের নাম?'

'তাঁর নামও ক্রুস। সত্যি বলতে কী, আমি নিজেই নিজের এজেন্ট—বলতে পারেন।'

'অ্যাঁ। তার মানে, আপনিই ডাক্তার ক্রুস?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার নামটা জানতে পারি?

'ডুবেল।'

'আপনি হয়তো ভাবছেন মিস্টার ডুবেল, আমার তেমন পসার নেই বলে রুগী পাকড়াতে অন্য ডাক্তারের চেম্বারে নিজেই রুগী সেজে বসে থাকি। আপনাকে জানিয়ে রাখি, চিকিৎসার জন্য রুগীর কাছ থেকে আমি কোনো ভিজিট নিই না। শুধু তাই না, প্রয়োজনে দরিদ্র রুগীদের আমি অর্থ সাহায্যও দিয়ে থাকি।'

'সত্যি?' ডুবেল এতক্ষণে নড়েচড়ে বসেন। 'দাতব্য চিকিৎসা চালাচ্ছেন বুঝি?'

'না, ঠিক তা নয়।' ক্রুস উত্তর দেন। 'চিকিৎসার বিনিময়ে অর্থ না নিলেও রুগীদের কাছ থেকে আমি অন্যরকম সাহায্য নিয়ে থাকি। আপনাকে সব খুলেই বলছি, কারণ আমার নিশ্চিত ধারণা—আপনিও একদিন আমার কাছে আসবেন। আমার পূর্বপুরুষ যে পরিমাণ অর্থ রেখে গেছেন তাতে রুগীদের কাছ থেকে ভিজিট না নিয়েও দিব্যি চলে যায়। আসলে আর পাঁচটা ডাক্তারের মতন চেম্বার খুলে না বসে আমি আপনার মতো রুগীদের অসুখ নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছি গত কয়েক বছর ধরে। বাড়িতেই আমার ল্যাবরেটরি—'

'তার মানে, রুগীদের ওপর আপনি এক্সপেরিমেন্ট চালান, এই তো?'

BanglaBook.org

'ঠিক তাই। রুগীদের সারিয়ে তোলার বিনিময়ে তাঁদের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সুযোগটুকুই শুধু চাই আমি।'আন্তরিক ভঙ্গিতে বলতে থাকেন ক্রুস। 'আপনি অবশ্য এক্ষুনি আমার কাছে আসবেন না, আমি জানি। আপনার অ্যাক্সিডেন্টের দরুন কোম্পানি থেকে ক্ষতিপূরণ বাবদ যে অর্থ পেয়েছেন তা যখন নিঃশেষ হয়ে যাবে তখন আমার কাছে আসবেন। এই রইল আমার কার্ড। আমার নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর—সবই রয়েছে এতে।'

হাত বাড়িয়ে কার্ডখানা নেয় ডুবেল। ঠিক তখনই ভেতরে যাওয়ার ডাক আসে। ওঁর সঙ্গে সঙ্গে ক্রুসও উঠে দাঁড়ান। ডুবেলের কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলেন, 'আশা করি, ডাক্তার ভিরোভালের কাছে নিয়মিত আসা-যাওয়া করলে মাস দু'য়েকের মধ্যেই আপনার রেস্ত ফুরিয়ে আসবে। তাহলে এখন থেকে মাস তিনেক পর আপনাকে আশা করব, কি বলেন?'

ডুবেলকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন ডাক্তার ক্রুস।

ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে ফুটপাথের ওপর উঠে দাঁড়ালেন ডুবেল। ফিরে যাবার ট্যাক্সি ভাড়াটুকুও আর পকেটে নেই! ডাক্তার ক্রুস ঠিকই বলেছিলেন। ভিরোভাল ওঁর চোখের আদৌ কোনো উন্নতি ঘটাতে পারেননি, অথচ তিনমাসের মধ্যেই ওঁর এখন কপর্দকশূন্য অবস্থা!

'এটাই ডাক্তার ক্রুসের বাড়ি। চলুন আপনাকে ভেতরে পৌঁছে দিয়ে আসি।' ট্যাক্সি ড্রাইভার এসে ডুবেলের হাত ধরেন।

কলিং বেল টিপতেই মহিলা কণ্ঠস্বর কানে আসে। ডুবেল নিজের পরিচয় দিতেই ভদ্রমহিলা ওঁর হাত ধরে বলেন, 'কর্তা তো এখন ড্রয়িং রুমে বসে আছেন। আমার সঙ্গে আসুন।'

অনেকগুলি ঘর পেরিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে হয় ডুবেলকে। ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে ভারী একটা দরজা খুলে যায়। ঘরের ভেতর থেকে ক্রুস এর পরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

'আরে, মিস্টার ডুবেল যে! আসুন, আসুন। আইরিন, তুমি যেতে পারো।'

মহিলার কোমল আঙুলের স্পর্শ মুছে যায়। তার বদলে ক্রুস এর শক্ত মুঠিতে বাঁধা পড়েন ডুবেল।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, এই চেয়ারটার আরাম করে বসুন।' সযত্নে ডুবেলকে গদি আঁটা একটা চেয়ারে বসিয়ে দেন ক্রুস। বলেন, 'দেখলেন তো, আমার কথাটাই শেষ পর্যন্ত ফলল। আপনার পকেট সাফ করে ফেলতে ডাক্তার ভিরোভাল মাস

BanglaBook.org

দু'য়েকের বেশি সময় নেননি। আমার কাছে আসার ব্যাপারে নিশ্চয়ই আপনার সঙ্কোচ বোধ হচ্ছিল—তাই না?'

'আমায় সারিয়ে তোলার বিনিময়ে আপনি আমার কাছ থেকে ঠিক কী প্রত্যাশা করেন?' শান্ত গলায় জানতে চান ডুবেল।

'সব খুলেই বলি তাহলে।' ক্রুস শুরু করেন। 'আপনার মতোই একজনকে খুঁজে বেড়াচ্ছি আমি। আমার বহুদিনের গবেষণার ফসল—'ইলেকট্রনস্কোপ' নামে খুদে একটা যন্ত্রের কার্যকারিতা প্রমাণের জন্য আপনার সাহায্য চাই। একটা ছোট্ট অস্ত্রোপচারের সাহায্যে আমার ওই ইলেকট্রনস্কোপের সরু চুলের মতো রূপোর তারগুলোকে আপনার চোখের নার্ভের সঙ্গে জুড়ে দেব। তাহলেই আপনি অদ্ভুত সব জিনিস দেখতে পাবেন—যা দুনিয়ায় কেউ কখনও চর্মচক্ষে দেখেনি!'

'কী সেটা?'

'আপনি ইলেকট্রনের প্রবাহ দেখতে পাবেন। ইলেকট্রিক তারের মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রন ছুটে চলেছে—সেই দৃশ্যটা একবার কল্পনা করুন। তাছাড়া এক্স-রে, আলট্রাভায়োলেট বা ইনফ্রারেড রশ্মি—মানে যেসব আলো আমাদের কাছে অদৃশ্য —তাও আপনার দৃষ্টি এড়াবে না!'

'বুঝলাম। কিন্তু পরীক্ষাটা তো যে কারোর ওপর করে দেখা যায়।' আমতা আমতা করে বলে ওঠেন ডুবেল।

'না, তা যায় না। প্রথমত, চোখের দৃষ্টি যার অক্ষুণ্ণ রয়েছে তার ওপর এ পরীক্ষা চালানো সম্ভব নয়। স্বাভাবিক দৃষ্টি সেক্ষেত্রে অদৃশ্য আলো দেখার ক্ষেত্রে বাধা দেবে। আবার জন্মান্ধ বা বহুদিন আগে অন্ধ হয়েছেন এমন লোকের অপটিক নার্ভ শুকিয়ে যাবার সম্ভাবনা খুব বেশি। যেহেতু অ্যাক্সিডেন্টটা অল্পদিন আগেই ঘটেছে, আপনার নার্ভগুলো অটুট না থাকার কারণ নেই। হ্যাঁ, আপনার ওপর পরীক্ষাটা অল্পদিনের জন্যেই চালাব; তারপরই করব আপনার আসল চিকিৎসা। আপনার স্বাভাবিক দৃষ্টি আমি ফিরিয়ে দেব—কথা দিচ্ছি। সেজন্য আমাকে কিছু দিতে হবে না, বরং যদ্দিন না আপনার স্বাভাবিক দৃষ্টি ফিরে আসছে, আমার কাছে থেকে নিয়মিত অর্থসাহায্য পাবেন।'

'বেশ, আমি রাজি। উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে ওঠেন ডুবেল। 'তা, অপারেশনটা কখন করবেন?'

'শিগগিরই। তবে তার আগে আপনার বাড়িতে একটা খবর দেওয়া দরকার—এখন দিনকতক আপনি এখানেই থাকবেন।'

'আমার চারদিকে জমাট বাঁধা ঘন কালো অন্ধকার। অন্ধকারকে কি মাপা

BanglaBook.org

যায়? কতটা অন্ধকার পেরিয়ে গেলে আলোয় পৌঁছব?'—বিড়বিড় করে কথাগুলো বলে চলেছিলেন ডুবেল। ওঁর চোখ দু'টো সাদা ব্যান্ডেজে ঢাকা। বহুক্ষণ আগেই জ্ঞান ফিরেছে ওঁর।

'অন্ধকার ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছেন?' ডুবেলের ওপর ঝুঁকে পড়ে প্রশ্ন করেন ডাক্তার ক্রুস।

'হ্যাঁ, মনে হচ্ছে যেন কিছু একটা দেখলাম,' ডুবেলের কথাগুলো যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসে, 'আচ্ছা একটা আলো, অথবা আলেয়াও বলা যায়। এই ছিল, এই মিলিয়ে গেল!'

'ভালো করে দেখুন, যা দেখছেন সমস্ত আমায় খুলে বলুন।' ক্রুস-এর উত্তেজনা আর চাপা থাকে না।

'আরে! এ তো দেখছি, অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে—চারপাশে আলোর মৃদু রেখা দেখতে পাচ্ছি। আলোর রেখাগুলো কাঁপছে, কখনও ওগুলোকে ঢেউ-এর মতো দেখাচ্ছে! রঙটাও কেমন ঈষৎ নীলচে—'

'আলোর ঢেউ দেখতে পাচ্ছেন? সন্ধে হয়েছে অনেকক্ষণ, এ ঘরের আলোও তো তেমন জোরালো নয়!'

'ওগুলো কীসের আলো তা আমি বলতে পারব না। তবে মুঠো মুঠো আলো যেন ঘরের মধ্যে আমার চারপাশে কেউ ছড়িয়ে দিচ্ছে! জানি না এগুলিই মহাজগৎ থেকে আসা রশ্মি কিনা। আশ্চর্যের কথা, ইলেকট্রিক তারের ভেতরও আমি মৃদু আলোর রেখা দেখতে পাচ্ছি!'

ডাক্তার ক্রুস্-এর হাত ধরে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ান ডুবেল। ধীর পায়ে গিয়ে দাঁড়ালেন সুইচ বোর্ডের কাছে। তারপর সুইচের ওপর একটা আঙুল রেখে অন্য বালব্‌টাকে দেখিয়ে দেন। মৃদু হেসে বলেন, 'আপনার ঘরের ইলেকট্রিক ওঅ্যারিং-এ কিছু গলদ দেখতে পাচ্ছি ডাক্তার। ওই তো কোণের দিকটায় তারের ইনসুলেশন উড়ে গিয়ে দেয়ালের গায়ে তারটা ঠেকছে। আমি পরিষ্কার দেখছি, ইলেকট্রন নষ্ট হচ্ছে। একটা মিস্ত্রি ডাকিয়ে বরং ঠিক করে নিন।'

'অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য!' উত্তেজনায় ছটফট করতে থাকেন ক্রুস।

'আমার কাছে আসুন, আরও অদ্ভুত কথা আপনাকে শোনাচ্ছি।' ফিসফিস করে বলে ওঠেন ডুবেল। 'আপনার মাথার ভেতর থেকে ঈষৎ গোলাপী আলো বেরিয়ে আসছে—'

'মস্তিষ্কের কোষগুলির মধ্যে যে বিদ্যুৎপ্রবাহের আদানপ্রদান ঘটে চলেছে—এটা তারই প্রমাণ।' ডুবেলকে বোঝাতে চেষ্টা করেন ক্রুস। 'সত্যি, আমার যে আজ কী আনন্দ হচ্ছে! আমার এতদিনের সাধনা আজ সার্থক। আপনি এই

BanglaBook.org

মুহূর্তে কত বড় ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন তা কি বুঝতে পারছেন? আমি গাড়ি বের করছি, চলুন আপনি আর আমি ঘুরতে বেরব। আজ রাতে আপনি যা যা দেখবেন, আমায় সব বলবেন।'

........ডুবেলের সামনে এখন অদেখা আলোর নতুন এক জগৎ। ইলেকট্রিক তারে আপাদমস্তক জড়ানো শহরের চারদিকে শুধু আলোর নক্সা। গাড়ির ব্যাটারি থেকে শুরু করে শহরের চারদিকে ছড়িয়ে থাকা বৈদ্যুতিক মোটর আর জেনারেটর থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছে রঙ-বেরঙের আলো—সমস্ত রাস্তাগুলো যেন আলোর বন্যায় স্নান করে উঠেছে! উঁচু উঁচু বাড়িগুলোকে ঘিরে আলোর জাল। সেই সঙ্গে চারদিকে বেতার তরঙ্গের ছোটাছুটি—তার মধ্যে দিয়েই ছড়িয়ে পড়েছে মহাজাগতিক রশ্মিকণা। অবাক বিস্ময়ে সেইসব দেখতে থাকেন ডুবেল।

'আপনি কি বুঝতে পারছেন, যে ক্ষমতা আপনি আয়ত্ত করেছেন তা পেতে বহু বিজ্ঞানী তাঁদের চোখ দুটোকে চিরতরে বিসর্জন দিতেও রাজি হবেন? সাধারণ চোখ দিয়ে আমাদের এই পরিচিত জগৎকে দেখার বদলে অদৃশ্য আলোর জগতে পৌঁছোতে পারলে নিজেদের তাঁরা ধন্য বলে মনে করবেন! মিস্টার ডুবেল, আগামীকাল আমি সাংবাদিকদের ডাকব; আপনি দেখবেন, কদিনের মধ্যেই আপনি কত বিখ্যাত হয়ে উঠেছেন।'

ক্রুস-এর কথা প্রমাণিত হতে সময় লাগল না। সমস্ত খবরের কাগজের প্রথম পাতায় ক্রুস আর ডুবেলের ছবি বেরলো। রেডিও-টেলিভিশনে ওঁদের সাক্ষাৎকার প্রচারিত হল দফায় দফায়। এবং তার ফলেই ডুবেলের অদ্ভুত ক্ষমতাকে ব্যাবসায়িক কাজে লাগানোর বুদ্ধিটা এলো অনেকের মাথায়।

এক প্রখ্যাত বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থা তাঁদের মাটির নিচের কেব্‌ল্ থেকে বিদ্যুৎ অপচয়ের ব্যাপারটা ধরতে ডুবেলকে কিছুদিনের জন্য নিয়োগ করল। এরপর এক বড়সড় অফার এল ইউনিভার্সাল ইলেকট্রিক কোম্পানির কাছ থেকে। ওখানকার বিজ্ঞানীরা গবেষণাগারে নানা ধরনের অদৃশ্য রশ্মি—যেমন এক্স-রে, গামা-রে, অতিবেগুনি আলোর স্বরূপ সম্পর্কে গবেষণা চালাচ্ছিলেন। ডুবেলকে ওই কাজে সাহায্য করার জন্য আবেদন জানালেন সেই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ। বিনিময় মোটা অর্থের টোপ রাখা হল ওঁর সামনে।

ডুবেলের কর্মব্যস্ত জীবন শুরু হল নতুন করে। সকাল আটটায় তাঁকে গিয়ে বসতে হয় ওজোন-বাষ্প এবং নানাধরনের রাসায়নিকের গন্ধে ভরা এক ল্যাবরেটরিতে। বিভিন্ন ধরনের যন্ত্র থেকে যে সব আপাত অদৃশ্য আলোর সৃষ্টি হয় তার আকৃতি প্রকৃতি বর্ণনা করতে হয় ওঁকে। দুজন স্টেনোগ্রাফার সযত্নে

BanglaBook.org

লিখে নেন ওঁর সব কথাগুলো। ডুবেলের সাহায্য নিয়ে কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক সমস্যার সমাধান হল অল্পদিনের মধ্যে।

ক্রুস ও ওঁর ওপর কিছু কিছু পরীক্ষা চালান। ক্রুস-এর বাড়িতেই এখনও আছেন ডুবেল।

'যদিও এই অদ্ভুত ক্ষমতা আমায় যথেষ্ট অর্থ ও ক্ষমতা দিয়েছে, তবু মনে হয়—যাদের স্বাভাবিক দৃষ্টি রয়েছে তারা অনেক বেশি ভাগ্যবান।'আক্ষেপ করে কথাগুলো ক্রুসকে একদিন বলে ফেললেন ডুবেল। 'আমার চোখ থেকে অন্ধকার দূর হলেও এই জগতের স্বাভাবিক রূপ-রং থেকে আমি বঞ্চিত!'

'আমাদের মধ্যে যে চুক্তি হয়েছিল তাতে অবশ্য আপনাকে স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেওয়ার কথা।'......উত্তর দিলেন ক্রুস। 'আপনি যদি চান তবে এখনই সেটা সম্ভব হতে পারে।'

'দয়া করে তাই করুন'। অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলেন ডুবেল। 'সত্যি বলতে কি; মাঝেমাঝে মনে হয়—আমি যেন নিজেই একটা যন্ত্র হয়ে গেছি! বিজ্ঞানীরা-ব্যবসায়ীরা আমায় যন্ত্রের মতো কাজে লাগাচ্ছেন! এ জীবন থেকে আমায় মুক্তি দিন, ডাক্তার।'

ডুবেলের জীবনের সবচেয়ে সুখের মুহূর্তটি এল একসময়। ডাক্তার ক্রুস ওঁর চোখে নতুন করে অস্ত্রোপচার করলেন এবং চোখের ব্যান্ডেজ খোলার পর ডুবেল তাঁর পুরনো চেনা পৃথিবীকে নতুন করে ফিরে পেলেন। ডাক্তার ক্রুস-এর ঈষৎ হলদেটে মুখ, সুন্দরী নার্সের আনাগোনা, জানলার কাচে লেগে থাকা বৃষ্টির ফোঁটা, জলে ভেজা সবুজ গাছ—সব কিছুই অপরূপ হয়ে ধরা দিল ডুবেলের চোখে।

'আপনাকে যে কী বলে ধন্যবাদ দেব—'। আনন্দে-কৃতজ্ঞতায় ডুবেলের চোখ দিয়ে জল গড়ায়।

'ধন্যবাদের কিছু নেই। আপনার সাহায্য না পেলে আমিও কী কোনোদিন সাফল্যের মুখ দেখতাম? আপনার দৃষ্টি ফিরিয়ে দেব বলে যে কথা দিয়েছিলাম, তা রাখতে পেরে, আমিও আপনার চেয়ে কম আনন্দিত নই। সে যাক গে, এখন কী করবেন ভাবছেন?'

'এই মুহূর্তে তা বলতে পারছি না। হয়তো আমার পুরনো চাকরিটা ফিরে পাব। তবে, আপনার বোঝা হয়ে আর আমি থাকব না। আজই আমি একটা বাসা ঠিক করে, এখান থেকে উঠে যাব।'

দুহাত দিয়ে ডাক্তারের হাত জড়িয়ে ধরে বিদায় নেওয়ার জন্য তৈরি হলেন ডুবেল।

BanglaBook.org

মাস ছয়েক পরের ঘটনা। কলিং বেলের আওয়াজ শুনে দরজা খুলতেই ডুবেলকে দেখতে পেলেন ক্রুস।

'ডাক্তার, আপনি আমার স্বাভাবিক দৃষ্টি একদিন ফিরিয়ে দিয়েছিলেন; সেজন্য আপনার কাছে কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। আমি সব আগের মতো পরিষ্কার দেখতে পাই—'

'কোথায় কাজ করছেন এখন?' স্বাগত ভঙ্গিতে জানতে চান ক্রুস।

'কাজ? কাজের কথা বলছেন?' ডুবেলের মুখে করুণ হাসি। 'আপনাকে আমি অনুরোধ করতে এসেছি—দয়া করে আবার আমায় অন্ধ করে দিন। ইলেকট্রনের ছোটাছুটি ছাড়া আর কিছুই দেখতে চাই না আমি।'

'নিজের থেকেই আবার অন্ধ হতে চান? আপনি কি উন্মাদ হলেন?'

'কী করব বলুন?' অসহায়ভাবে বলে ওঠেন ডুবেল। 'চোখ দুটো ফিরে পেয়ে দেখি, আমায় নিয়ে আর কারোর কোনো আগ্রহ নেই। একটা মামুলি কাজও জোগাড় করতে পারলাম না। এভাবে বেকার বসে থাকার চেয়ে আমার সেই পুরনো ক্ষমতাটাই ফিরে পাওয়া শ্রেয় নয় কি?'

'কিন্তু তা তো আর সম্ভব নয়।' ধীরকণ্ঠে জবাব দেন ডাক্তার ক্রুস। 'আপনি বোধহয় জানেন না, ইউনিভার্সাল ইলেকট্রিক কোম্পানি আমার ইলেকট্রনস্কোপের পেটেন্ট কিনে নিয়ে ইতিমধ্যেই এমন সব যন্ত্রপাতি তৈরি করেছে যার সাহায্যে অদৃশ্য আলোর প্রকৃতি আর ধর্ম অনায়াসেই জানা যায়। এর জন্য অন্ধ মানুষদের কাজে লাগানোর আর প্রয়োজন নেই।'

'তাই বুঝি?' দীর্ঘশ্বাস ফেলে পেছন ফেরেন ডুবেল। ডাক্তারের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার কথাটা ভুলে সামনের রাস্তার দিকে কেমন এক শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন উনি।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

মৃত্যুঘর

হারমান ম্যাক্সিমভ

'সিম-ক্রি' গ্রহের ইতিহাস যারা পড়েছে তারা জানে, বহুবছর আগে ওই গ্রহে আশ্চর্য এক মৃত্যুঘর বানানো হয়েছিল। ওখানকার ইতিহাসের ৭৬নং অধ্যায়ের ৪৯১ নং পরিচ্ছেদে 'মৃত্যুঘর' প্রসঙ্গে যে কথা কটি লেখা আছে তা অনেকটা এইরকম ঃ...শাসনকর্তা 'লাক্-ইফার-শি'র আদেশে এক মৃত্যুঘর তৈরি করা হয়। অদ্ভুত চেহারার সেই বিরাট বাড়িটা টিকে ছিল ওই গ্রহের হিসেবে প্রায় ১৫ বছর। প্রাপ্তবয়স্ক যে কোনো মানুষ যদি মনে করত যে তার আর বেঁচে থাকার দরকার নেই, সে এসে দাঁড়াত মৃত্যুঘরের দরজার সামনে। তারপর, কেউ তাকে আর কোনোদিন দেখতে পেত না; স্রেফ যেন উবে যেত সে!........

'ভেল্ট' নামে এক বিখ্যাত মেকানিক ওই মৃত্যুঘরের স্রষ্টা। আশ্চর্যের কথা— লোকটা নিজেই আবার তা ধ্বংস করেছিল!

'এটাই তাহলে তোমার চরম সিদ্ধান্ত?'

বড় বড় হরফে লেখা কথাটা ফুটে আছে দরজার গায়ে। একসময় হরফগুলো লেখা হয়েছিল হলুদ রঙে; এখন অবশ্য তাতে খানিকটা কালচে ভাব এসেছে। এটা যে ধুলো-কালির আস্তরণের জন্য তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। দরজার সারা শরীরে নখের আঁচড় দিয়ে, তাড়াহুড়োয় লেখা অসংখ্য নাম—সেই তাদের নাম যারা ওই দরজা দিয়ে একদিন ভেতরে ঢুকেছে, আর কখনও বেরিয়ে আসবে না বলে। দরজার পাশে এককোণে পড়ে রয়েছে স্তূপীকৃত জামাকাপড় আর জিনিসপত্র—ভেতরে ঢোকার সময় দরজার বাইরে যা অবহেলায় ফেলে গেছে লোকে।

'এটাই তাহলে তোমার চরম সিদ্ধান্ত?'

এ প্রশ্নের উত্তরের ওপর নির্ভর করছে সবকিছু। ভেল্টের মনে হল—বুকের মধ্যে কে যেন হাতুড়ি পেটাচ্ছে! কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে ভেল্ট নিচু গলায় বলল, 'হ্যাঁ'।

স্টিলের দরজাটা নিঃশব্দে খুলে গিয়ে ভেতরে যাওয়ার রাস্তা দেখিয়ে দেয়। ভেল্ট দেখল, সামনে এক বিরাট সুড়ঙ্গের মুখ; ভেতরের ইলেকট্রিক বাল্বের

BanglaBook.org

গায় মাকড়সার জাল—আধো অন্ধকারে রহস্যময়। 'ক্ল্যাক্', 'ক্ল্যাক্', 'ক্ল্যাক্'—সুড়ঙ্গের ভেতর থেকে ভেসে আসা ওই শব্দটুকু ছাড়া চারপাশে জীবনের আর কোনো অস্তিত্ব নেই। ক্ষণিকের জন্য ভেল্ট-এর মনে হয়—একছুটে পালিয়ে যায় দরজার বাইরে, সূর্যের আলোয় বেড়ে ওঠা সতেজ ঘাসের বুকে।

কিন্তু সবুজের বুকে ফিরে গেলেও নিজের অতীতকে তো আর এই দরজার পাশে রেখে যাওয়া যাবে না। মায়ের চোখের জল, বাবা আর ভাইদের ঘৃণা, এই দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকা মানুষগুলির আত্মীয়-বন্ধুদের অভিশাপ—এ সবই তো তার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। চোয়াল দুটো আপনা থেকেই শক্ত হয়ে যায়। ভেল্ট চিৎকার করে ওঠে, 'হ্যাঁ, সবকিছু ভেবেই আমি এখানে এসেছি।'

ভেল্ট-এর পেছনে দরজাটা আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যায়। আধো-অন্ধকার প্যাসেজ ধরে এগিয়ে গিয়ে ভেল্ট ঢোকে ঠিক সামনের ঘরটায়। ঘরের মধ্যে আলোর জোর অনেক বেশি, ঘরটার আকৃতিও অদ্ভুত, চারপাশের দেয়াল, পায়ের তলার মেঝে, মাথার ওপর ছাদ—সবকিছুই আয়নার টুকরো দিয়ে মোড়া। অসংখ্য আয়নায় অসংখ্য প্রতিচ্ছবি! দেখে কেমন দৃষ্টি বিভ্রম হয়; এই মনে হয়—ঘরখানা কী ছোট্ট, পরক্ষণেই আবার তা বিশাল হলঘরের চেহারা নেয়।

ভেল্ট জানে—এটা স্বীকারোক্তির ঘর। ওর চারপাশে নিজের হাজার হাজার প্রতিবিম্ব! ঘরে ঢোকার সময়কার সেই ভয়-ভয় ভাবটা আস্তে আস্তে কেটে যায়। ও দেখে—ঘরের এক কোণে রয়েছে স্বীকারোক্তি আদায়ের সেই যন্ত্রটা। যন্ত্রের সামনে একটা চেয়ার; ভেল্ট এগিয়ে গিয়ে চেয়ারটা বসে।

'কে তুমি, জীবনের শেষ চৌকাঠ পেরিয়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছ?'

এত মৃদু ও নম্রস্বরে প্রশ্নটা ভেসে এলো যে প্রথমটায় ভেল্ট-ও চমকে ঘরের চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। নাহ্, চারপাশে শুধু তারই নিঃশব্দ প্রতিচ্ছবি। ভেল্ট চোখ ফিরিয়ে আনল মেশিনের দিকে। যন্ত্রটা তার পরিচয় জানতে চাইছে। ওর স্মৃতিতে ভিড় করে এল ছোটবেলার সব কথা। ছোটবেলার সেই গ্রাম—ধুলো-পায়ে, পরনে ছোট্ট হাফপ্যান্ট—ভেল্ট ছুটে চলেছে বাড়ির দিকে। মা তাকে খুঁজছেন, নাম ধরে ডাকছেন; ও ছুটতে ছুটতে এসে মুখ লুকোল মায়ের কোলে।

'তোমার নাম কী?' যন্ত্র আবার প্রশ্ন করে।

এক ঝটকায় স্মৃতিগুলিকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে ভেল্ট বলে ওঠে, 'আমি ভেল্ট—নিপ-মা-গালিট; এই 'সিম-ক্রি' গ্রহের সবচেয়ে সম্মানিত, সবচেয়ে দক্ষ কারিগর।'

'তুমি কবে এবং কোথায় জন্মেছ?'

BanglaBook.org

ভেল্ট গ্রামের নাম এবং জন্মসময় জানায়।

খানিকক্ষণ সব চুপচাপ। যন্ত্রটা যেন ভেল্ট-এর উত্তরগুলো সঠিক কি না তা যাচাই করছিল। একটু পরেই যন্ত্রের ভেতর থেকে কাঁপা কাঁপা খোনা স্বরে গান ভেসে এল। ওই তীক্ষ্ণ আওয়াজে প্রথমে ভয়ে চমকে উঠেছিল ভেল্ট। গানের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রের ভেতর থেকে বিকট সব শব্দ বেরোচ্ছিল! ভেল্টের মনে হল—কেউ যেন প্রচণ্ড জোরে থুতনিতে ঘুসি মেরেছে। ভয়ে—আতঙ্কে ও লাফিয়ে উঠল, আর সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠল ওর হাজার হাজার প্রতিবিম্ব!

এ কী আশ্চর্য ব্যাপার! সে লোকটা মরতে চলেছে, যন্ত্রটা কোথায় তাকে একটু সান্ত্বনা দেবে—তা না, এরকম বিচ্ছিরি গান? ভেল্টের ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিল। যন্ত্রটার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে একঘেয়ে সুরে কতগুলি শব্দ—

'এ লোকটার যাওয়ার কোনো জায়গা নেই—জায়গা নেই—

আজ তাই এসেছে এখানে-এখানে-এই মৃত্যুঘরে।.......'

যন্ত্রটা হঠাৎ গান থামিয়ে ছকে বাঁধা ঢঙে জিজ্ঞাসা করে, 'যাদের সঙ্গে তোমার রক্তের সম্পর্ক, এখানে আমার আগে কি বিদায় নিয়েছ তাদের কাছ থেকে?'

ভেল্ট-এর কাছে প্রশ্নটা অবান্তর বলে মনে হল। বিরক্ত হল ও।

'তুমি কি তোমার আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসেছ?'—আবার সেই যান্ত্রিক প্রশ্ন।

'আমার কোনো নিকট-আত্মীয় নেই। গালিট্ বংশের আমিই শেষ মানুষ।'

'তোমার বন্ধুদের বলেছ?'

'সিম-ক্রি গ্রহে সৎ মানুষের সংখ্যা এখন বড়ই কম।.......আমার কোনো বন্ধু নেই।'

'তাহলে, তুমি যে এখানে এসেছিলে—সে খবরটা আমি কাকে জানাব?' যন্ত্রের গলায় বিস্ময়।

ভেল্ট একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আমার শেষ খবরটা শুধু আমাদের মহামান্য শাসনকর্তা পেলেই চলবে। শুনে উনি খুশি হবেন।'

হ্যাঁ, শাসনকর্তার খুশি হওয়ারই কথা। অন্তত ভেল্ট তাঁকে যেসব অপমানকর চিঠি লিখেছে তা মনে রেখে ওর মৃত্যু সংবাদে লোকটাকে খুশি হতেই হবে। বড়জোর হয়তো লোক দেখানোর জন্য বলবেন—'আহা, আমাদের সবচেয়ে সেরা মেকানিক, সে কিনা আত্মহত্যা করল!'

'সারা জীবনে তুমি কি কোনো ভালো কাজ করেছ?'

যন্ত্রের স্বর এখন আগের তুলনায় বেশ অন্তরঙ্গ, নরম। ভেল্ট সারা জীবনে কি কখনো কোনো ভালো কাজ করেনি? নিশ্চয়ই করেছে। আসলে, কোনো

BanglaBook.org

লোকের পক্ষেই একটাও ভালো কাজ না করে গোটা জীবনটা কাটানো মুশকিল। ভেল্ট চোখ বুজে তার ভালো কাজগুলোকে মনে করার চেষ্টা করে। ও একবার এমন জিনিস বানিয়েছিল যার সাহায্যে খনি থেকে খুব সহজেই ধাতু নিষ্কাশন সম্ভব। এটা নিশ্চয়ই খুব ভালো কাজ। তা না হলে, রাস্তায় তার মূর্তি বসানো হবে কেন? তাছাড়া ভেল্ট তরঙ্গতত্ত্বের সূত্র আবিষ্কার করেছিল। তবে তার সবসেরা সৃষ্টি, হল........

'আমি যে জীবনে ভালো কাজ কিছু করেছি, তার প্রমাণ তো তুমি নিজেই। আমিই তো তোমাকে সৃষ্টি করেছি।'

'আমাকে?'—যন্ত্রের কণ্ঠে বিস্ময়।

'হ্যাঁ। শুধু তোমাকেই নয়, আমি তৈরি করেছি এ বাড়ির যাবতীয় জিনিস; আমিই তো এই মৃত্যুঘরের স্থপতি।'

'সত্যি বলছ?'

'মৃত্যুর আগে শেষ স্বীকারোক্তির সময় কেউ কি মিথ্যে কথা বলে?'

'বেশ, তুমি নিজেই যদি এই মৃত্যুঘর বানিয়ে থাকো তবে নিশ্চয়ই জানো—এরপর তোমার কী হবে?'

'জানি'। ভেল্ট দৃঢ়ভাবে জবাব দেয়। 'আমার স্বীকারোক্তির পালা শেষ হলেই সামনের ওই দরজাটা খুলে যাবে। দরজার ওপারে সিঁড়ি নেমে গেছে নিচে। যদ্দূর মনে পড়ছে—মোট বিয়াল্লিশটা ধাপ আছে ওই সিঁড়িতে। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় কোনো একটা ধাপে পা রাখামাত্র ইলেকট্রিকের প্রচণ্ড শক্ খেয়ে গড়িয়ে পড়ব আমি। কোন ধাপে যে তুমি ইলেকট্রিক কারেন্ট পাঠাবে তা অবশ্য জানি না। একেক জনের ক্ষেত্রে সেটা একেক রকম। ইলেকট্রিক শক খেয়ে অজ্ঞান হলেও মরবই যে এমন কথা নেই। সেই কারণেই সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে গিয়ে আমার শরীরটা যাতে একটা চৌবাচ্চায় পড়ে তার ব্যবস্থা আছে। ওই চৌবাচ্চায় রাখা আছে এক বিশেষ রাসায়নিক দ্রবণ—যার সাংকেতিক নাম 'কিউ'। ওই রাসায়নিক দ্রবণের সংস্পর্শে আসার মাত্র সাত সেকেন্ডের মধ্যে আমার শরীরের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না!

'উঁহু, তোমার জামার প্লাস্টিকের বোতামগুলো থেকে যাবে।' যন্ত্রের স্বরে ক্ষোভের সুর স্পষ্ট। ''কিউ' দ্রবণে প্লাস্টিক গলে না। সেজন্যেই আমাকে এর মধ্যে অন্তত তিনবার ড্রেনপাইপ সাফ করতে হয়েছে।'

ভেল্টের ইচ্ছে হল—হো হো করে হেসে ওঠে। তাহলে ব্যাটা যন্ত্র—প্লাস্টিকের বোতামগুলো নিয়ে তো তুমি সত্যি বড় ফ্যাসাদে পড়েছ! ভেল্ট বুঝতে পারছিল, হাসির তুফান তার বুক থেকে গলা, গলা থেকে ঠোঁটে উঠে

BanglaBook.org

আসছে। হ্যাঁ, বুড়ি ঠাকুমারা যেমন তাদের নাতিরা ক্রমাগত প্যান্ট নোংরা করলে অথবা রান্নাঘর থেকে খাবার চুরি করে খেলে, ঘ্যানর ঘ্যানর করে এর-ওর কাছে নালিশ করে বেড়ায়, যন্ত্রটা ঠিক তেমনিভাবে ওর ড্রেনপাইপের অসুবিধের জন্য অনুযোগ করছে। আহা, এই যে প্রতিদিন শয়ে শয়ে লোক এসে মৃত্যুঘরে ঢুকছে, তাতে যন্ত্রটার কোনো আপত্তি নেই.....শুধু তাদের জামার বোতামগুলো যদি প্লাস্টিকের বদলে অন্য কিছু দিয়ে তৈরি হত।

'তুমি হাসছ?' যন্ত্র বলে ওঠে। 'এখানে আসার পর অনেকেই অবশ্য নার্ভাস হয়ে গিয়ে এরকমভাবে হাসে।'

ভেল্টের গোটা শরীর হাসিতে আবার কেঁপে ওঠে।

'এবারে বলো, সারা জীবনে তুমি কী কী খারাপ কাজ করেছ?'

যন্ত্রের গমগমে আওয়াজ মিলিয়ে যেতেই ভেল্ট বলল, 'হ্যাঁ, আমি খারাপ কাজও করেছি।'

'কী সেটা?'

'আমি তোমাকে তৈরি করেছি।'

'তোমার কথা কেমন এলোমেলো, কিছুই বুঝতে পারছি না—' যন্ত্র বলে ওঠে। 'এই তো একটু আগেই বললে, আমাকে সৃষ্টি করাটাই নাকি তোমার জীবনের সবচেয়ে ভালো কাজ!'

'ভালো কাজটা কখনোও কখনোও খারাপ হয়ে যায়....।'

'সত্যি, কিছু বুঝতে পারছি না।' যন্ত্রের স্বরে অসহয়তা ফুটে ওঠে।

'কী করে বুঝবে? তুমি তো শুধুই একটা যন্ত্র—' ভেল্টের ঠোঁটের কোণে হাল্কা হাসির রেখা।

'কিন্তু তোমার কথার অর্থ আমায় বুঝতে হবে। ভালো কাজটা কেন খারাপ হয়ে গেল? আচ্ছা, তুমি তখন কেন বললে, আমায় সৃষ্টি করে তুমি জীবনের সবচেয়ে ভালো কাজ করেছ?'

'আমার ধারণা হয়েছিল—আমি এমন কিছু একটা সৃষ্টি করছি যা আমাদের গ্রহের সমস্ত অধিবাসীকে সাহায্য করবে—'

ভেল্টের কথা শেষ হওয়ার আগেই যন্ত্র বলে ওঠে, 'সাহায্য করবে? মানে, মরে যেতে সাহায্য করবে?'

'না। আমি ভেবেছিলাম—এই মৃত্যুঘর ওদের বেঁচে থাকার ব্যাপারেই সাহায্য করবে।'

'বুঝতে পারলাম না।'

সত্যিই তো, একটা যন্ত্র এটা বুঝবে কী করে? আসলে মানুষ তো তখনই

BanglaBook.org

স্বাধীনভাবে বাঁচতে পারে যখন মৃত্যুটা থাকে তার নিজের হাতের মুঠোয়। যখন বেঁচে থাকার আর প্রয়োজন থাকে না, তখন যদি বিনাকষ্টে মারা যাওয়ার কোনো সহজ উপায় হাতের কাছে থাকে—তার চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে? ভেল্টের মনে পড়ল, তাদের গ্রহের প্রধান শাসনকর্তা লাক্-ইফার এইসব কথাগুলোই বলেছিলেন তাকে। যাঁরা বৃদ্ধ—চোখে দেখেন না, কানে শোনেন না, বেঁচে থাকার কোনো আগ্রহই যাঁদের নেই, অথচ আত্মহত্যা করতে ভয় পান—তাঁদের কাছে মৃত্যুঘর তো আশীর্বাদের মতো। লাক্-ইফার বলেছিলেন, 'আমি যখন বুড়ো হব, 'সিম-ক্রি' গ্রহের শাসনভার যখন আর বইতে পারব না—তখন আমিও নির্দ্বিধায় গিয়ে দাঁড়াতে পারব মৃত্যুঘরের দরজায়।'

লাক্-ইফার একটু থেমে আবার শুরু করেছিলেন, 'যে মানুষের বেঁচে থাকার কোনো আগ্রহ নেই তাকে বাঁচিয়ে রাখা শুধু অর্থহীনই নয়, উল্টে সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। যাদের কাছে নিজেদের জীবনের কোনো মূল্য নেই তারা সমাজের আর পাঁচজন মানুষেরও বেঁচে থাকার মধ্যে অর্থ খুঁজে পায় না। যারা মরতে চায় তাদের ইচ্ছাপূরণ যাতে হয় সেটা দেখাও তো আমাদের কর্তব্য........'

ভেল্টের মনে পড়ে, শাসনকর্তার ওইসব কথা তখন অনেকেই মেনে নেয়নি। তারা বলেছিল, 'এসব কথা মিথ্যে। এসব অন্যায় অপরাধ। এসব চিন্তা পাপ।' অবশ্য জোরগলায় চিৎকার করে কথাগুলো বলার সাহস কারোর ছিল না। ভেল্টের কানে এসব অভিযোগ অবশ্য পৌঁছোয়নি; ও আপনমনে নিজের কাজ করে গেছে। মৃত্যুঘরের উপযুক্ত জায়গা হিসেবে একটা বিশেষ উপত্যকাকে বেছে নিয়েছিল ভেল্ট। জায়গাটার চারপাশে উঁচু উঁচু পাহাড়। সবসুদ্ধ একুশটা আলাদা আলাদা টানেল তৈরি করেছিল ভেল্ট—যার প্রত্যেকটার ভেতর দিয়ে মৃত্যুঘরের মূল ফটকের সামনে পৌঁছোনো যায়। মৃত্যুঘরের দিকে যাওয়ার সময় যাতে একজনের সঙ্গে অন্যজনের দেখা হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে সেই উদ্দেশ্যেই ওই ব্যবস্থা। মনস্তাত্ত্বিকদের সঙ্গে আলোচনা করে মৃত্যুঘরের মধ্যে এমন কিছু ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল যা জীবনের শেষ সময়টুকুতে মৃত্যুপথযাত্রীদের শান্তির ছোঁয়া দেয়, সহানুভূতির সঙ্গে তাদের অন্তিম ইচ্ছাপূরণের লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যায়।

'তুমি বলতে চাও—মৃত্যুঘর বানিয়ে তুমি এ গ্রহের মানুষদের জীবনকে সহজতর করেছিলে?'

আবার প্রশ্ন! চমকে উঠেছিল ভেল্ট; স্মৃতিচারণ করতে করতে যন্ত্রের অস্তিত্ব প্রায় ভুলতে বসেছিল।

'না। যা ভেবেছিলাম—সবকিছুই ঠিক তার উল্টো হয়ে গেল!'

BanglaBook.org

হ্যাঁ যে প্রত্যাশা নিয়ে ভেল্ট মৃত্যুঘর বানিয়েছিল—তা সব ওলটপালট হয়ে গেল। মৃত্যুঘর আত্মহত্যার ব্যাপারটাকে আইনের আশ্রয় তো দিলই, সেই সঙ্গে মানুষকে আত্মহত্যা করতে উৎসাহিত করল। হতাশাগ্রস্থ মানুষেরা সব দলে দলে আসতে লাগল মৃত্যুঘরের দরজায়। জীবনে পোড় খাওয়া লোকেরা যেমন আসত তাদের সব জ্বালা-যন্ত্রণা জুড়োতে—তেমনি মুহূর্তের উত্তেজনাও বহু মানুষকে টেনে আনত ওই মৃত্যুপুরীতে। ক্রমে মৃত্যুঘরে ঢুকে আত্মহত্যা করাটা যেন এক ফ্যাশন হয়ে দাঁড়াল!

ভেল্টের যাবতীয় খাটুনি বিফলে গেল। মৃত্যুঘর তার এক অপকীর্তির প্রতীক হয়ে রইল। ভেল্টের মনে পড়ে, হাজার হাজার চিঠি আসত প্রতিদিন। প্রত্যেক চিঠির মধ্যে দিয়ে মানুষের অভিশাপ এসে পৌঁছত তার কাছে। ও চারপশে অবিরাম ফিসফিস শব্দ শুনতে পেত। কখনোও কখনোও তার মনে হত, কেউ বুঝি তার চারপাশে গুমরে গুমরে কাঁদছে; কান্নার মধ্যে দিয়ে বলতে চাইছে, 'তুমি অপরাধী। মৃত্যুঘর বানিয়ে মহাপাপ করেছ।'

ভেল্টের একসময় মনে হয়েছিল—ও পাগল হয়ে যাবে। আর সেই ভয়েই পালিয়েছিল ওর পরিচিত লোকজনের কাছ থেকে অনেক দূরে—গ্রহের একেবারে অন্যপ্রান্তে। সেখানে অচেনা লোকের মাঝে ভিন্ন পরিচয়ে বহুবছর কাটানোর পর তার মনে হয়েছিল—এইবার বোধহয় ও নিজের জায়গায় ফিরতে পারে। নিশ্চয়ই এতদিনে সবাই ওর কথা ভুলে গেছে।

ভেল্টের দুর্ভাগ্য—কেউ ওকে ভোলেনি। বহুদিন বাদে ওকে দেখতে পেয়ে প্রথম যে বুড়িটা ছুটে এসেছিল তার কথাগুলো স্পষ্ট মনে পড়ে।

'শ্রদ্ধেয় ভেল্ট আপনি বলুন—সত্যিই কি আপনার বানানো ওই মৃত্যুঘরের মধ্যে ঢুকলে কারোর আর কোনোরকম ভয়ডর থাকে না?'

'তার মানে?' ভেল্ট প্রশ্নটা ঠিক ধরতে পারে না।

'আমার নাতি—একেবারে বাচ্চা। বিশ্বাস করুন, ওর বয়স সবে আঠারো পেরিয়েছে। সেও কেমন নির্ভয়ে মৃত্যুঘরে...'

ভেল্ট আর দাঁড়াতে পারেনি; ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল ওখান থেকে।

সেদিনই দেখা হয়েছিল পুরনো বন্ধু উরাম কারাখের সঙ্গে। ওর কাছেই ভেল্ট সেই ট্যাবলেটের কথা প্রথম জানতে পারে। উরাম ফিসফিস করে বলেছিল, 'ট্যাবলেটগুলো আসলে এত ছোট যে দেখলে তোমার বার্লির দানা বলে ভুল হবে। ওর একটা খেলেই যে কারোর মধ্যে আত্মহত্যা করার প্রবণতা জাগে! অনেক আবার বলছে—আমাদের শাসনকর্তা লাক্-ইফারের কারসাজিতেই নাকি

BanglaBook.org

এই 'বিষ' বাজারে সহজে মিলছে। কে বলতে পারে—যেসব লোকেরা আমাদের শাসনকর্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চায়, তাদের ধরে ধরে ওগুলো খাওয়ানো হচ্ছে না?'

পুরনো কথাগুলোই ভাবছিল ভেল্ট। ভাবনাগুলো ধাক্কা খেল যন্ত্রের কথায়।

'আর কিছু বলার থাকলে, বলতে পারো। স্বীকারোক্তির জন্য আরও চারমিনিট সময় তোমার প্রাপ্য।'

'কী লাভ?' ভেল্ট নিরাসক্ত গলায় বলল

'তার মানে? তুমি যে দেখছি মৃত্যুর জন্য উতলা হয়ে উঠেছ!'

'উঁহু। আমি আসলে তোমাকে ধ্বংস করার জন্যই উদগ্রীব।' ভেল্ট কথাগুলো যেন ছুঁড়ে মারল!

'আমাকে ধ্বংস করবে? নাহ্, সে ক্ষমতা কারোর নেই।'

'ভুলে যেয়ো না, আমিই তোমার সৃষ্টিকর্তা।'

'কিন্তু তোমার কাছে তো কোনো অস্ত্র নেই।'

'আমি নিজেই নিজের অস্ত্র!'

ভেল্টের চোখেমুখে উৎসাহের ঝিলিক। হ্যাঁ, ও তো জানতই, মৃত্যুঘর কোনো মানুষকেই অস্ত্র নিয়ে ঢুকতে দেয় না। আসলে, ভেল্টই তো এমন কায়দা করেছিল যাতে বাইরে থেকে কেউ একে ধ্বংস করতে না পারে।

'এখানে ঢোকার আগে আমি দুটো 'সিটেন' ট্যাবলেট খেয়ে নিয়েছি।'

'সেটা আবার কী?'

'একটা রাসায়নিক জিনিস।' ভেল্ট জবাব দেয়। 'একটু পরেই সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় ইলেকট্রিক শক খেয়ে যেই আমি ছিটকে পড়ব চৌবাচ্চায় রাখা 'কিউ'-এর দ্রবণের মধ্যে—সঙ্গে সঙ্গে তার সাথে 'সিটেন'-এর যে রাসায়নিক বিক্রিয়া হবে তার ফলেই একটা জোরালো বিস্ফোরণ...'

'অ্যাঁ, বিস্ফোরণ? না। তা আমি হতে দেব না। তোমাকে সিঁড়ির কাছে যেতেই দেব না আমি।' যন্ত্রের কণ্ঠে অগাধ প্রত্যয়।

'না, তা তুমি করতে পারো না। যে মানুষ একবার চৌকাঠ পেরিয়ে এ-ঘরে ঢুকেছে, সিঁড়ির কাছে সে যাবেই। তাকে আটকানোর সাধ্য কোনো যন্ত্রের নেই।'

থেমে থেমে জোর দিয়ে কথাগুলো বলে ভেল্ট এগিয়ে গেল ঘরের একটা নির্দিষ্ট দেয়ালের দিকে।

'আমি ভেল্ট—এখন সম্পূর্ণ প্রস্তুত।'

BanglaBook.org

দেয়ালজোড়া আয়নার কিছুটা অংশ সরে গিয়ে ভেতরে যাওয়ার সরু রাস্তা বেরিয়ে পড়ল ভেল্টের চোখের সামনে।

'একটুখানি দাঁড়াও!'

ভেল্ট দেখল মৃত্যুঘরের যন্ত্রটা বাঁচার জন্য কেমন আকুল হয়ে উঠেছে।

'দাঁড়াও। মৃত্যুঘরকে এভাবে ধ্বংস করো না। আমি তোমায় এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

'তোমাকে সে ক্ষমতা আদৌ দেওয়া হয়নি। আর কেউ না হোক, আমি তো সেটা জানি।'

'তুমি ঠিকই বলেছ।' যন্ত্রের গলায় বিষণ্ণতার ছোঁয়া। 'বেশ, তবে বিদায় জানাই তোমায়। সামনের দরজা দিয়ে এগোলেই সিঁড়ির ধাপ শুরু।'

'বিদায়।' ভেল্ট যন্ত্রের দিকে শেষবারের মতো ফিরল। তারপর সিঁড়ির দিকে এগোনোর আগে নিজের হাজার হাজার প্রতিবিম্বের কাছ থেকেও বিদায় নিল হাত নেড়ে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

সেই নীল বোতলটা

রে ব্রাডবারি

সূর্যঘড়িগুলি সাদা নুড়িতে ঢাকা। যেসব এবড়ো খেবড়ো পাথরের চাঁই-এর গায়ে একদিন বাতাস ডানা ঝাপটাত, সেগুলো এখন মুখ গুঁজে পড়ে আছে বালির বুকে। ওই বালির ওপর দিয়ে একদিন সাগরের জল বয়ে যেত—সে সাগর আজ শুকনো খটখটে! প্রাচীন শহরগুলো চাপা পড়ে আছে বালি আর পাথরের নিচে। মঙ্গলগ্রহ এখন মৃত!

চারদিকের নিস্তব্ধতা ভেঙে একটা ক্ষীণ যান্ত্রিক শব্দ এগিয়ে আসে। পুরনো আমলের একটা স্থলযান। তার মধ্যে বসে থাকতে দেখা যায় অ্যালবার্ট বেক এবং লিওনার্ড ক্রেগকে।

'হ্যালো!'

অ্যালবার্ট ফিসফিস করে বলে, 'ঈশ্বরের দোহাই, অমনভাবে চেঁচিয়ো না, শহরটার যেটুকু এখনোও খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তোমার চ্যাচানির ধাক্কায় সেটুকুরও আর মাটিতে মিশতে দেরি হবে না। আর তাহলে, আমাদের অ্যাদ্দূর আসাটা পণ্ডশ্রম হবে কিনা বলো?'

আবার খানিকটা নিস্তব্ধতা। শেষে অ্যালবার্টই মুখ খোলে। 'চলো, এবারে আস্তে আস্তে বাড়িগুলোর ভেতরে ঢোকা যাক।'

'তুমি তাহলে সত্যি সত্যিই ওই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ঢুকতে চাইছ?' লিওনার্ড বিরক্তিতে মুখ বেঁকায়। 'আর তাও কিনা সামান্য একটা বোতলের জন্য? সত্যি, কী যে আছে ওতে—কেন যে ওই হতচ্ছাড়া বোতলটাকে হাতানোর জন্য সবাই এমন পাগল?'

অ্যালবার্ট সন্তর্পণে গাড়ি থেকে নেমে আসে; তারপর গলা নামিয়ে বলে, 'কে জানে, কোন্ আদ্যিকালে মঙ্গলগ্রহের বাসিন্দারা ওই নীল বোতলটা বানিয়েছিল! আজ অবধি কত লোকের হাতেই না ওটা এসেছে, আবার হাতছাড়াও হয়েছে। আশ্চর্যের কথা—যারা বোতলটা পেয়েছিল তারা কেউ বলে যায়নি, কী ছিল তার মধ্যে!'

'তবুও তো পাগলের মতো খুঁজে চলেছ! মঙ্গলের এ প্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত—কোথায় যাওনি?'

BanglaBook.org

অ্যালবার্ট হসে। বলে, 'আরে ও বোতলের মধ্যে সত্যিই যে কী আছে তা জানা নেই বলেই না ওটা পাওয়ার জন্য সকলের এত উৎসাহ।'

'কিন্তু, সত্যি বলছি, তোমার এই পাগলামি আমার আর একটুও ভালো লাগছে না।' বিরক্তিতে ফেটে পড়ে লিওনার্ড।

'বেশ, বেশ, তুমি না হয় গাড়িতেই বসো।' লিওনার্ডকে যেন এড়িয়ে যেতে চায় অ্যালবার্ট।' এই বাড়িগুলো আমি একাই ঘুরে দেখছি।'......

মিনিট পনেরো পর দুজনকেই দেখা যায় সামনের বড় বাড়িটার ভেতরে। হঠাৎ অ্যালবার্ট বলে, 'একটা সুন্দর গন্ধ পাচ্ছ? খুব ভালো জাতের হুইস্কি কিংবা ব্র্যান্ডি—'

লিওনার্ড মুচকি হেসে বলে, 'ঘরে ঢোকার মুখে দেয়ালের ধারে একটা বোতলের মধ্যে ছিল। এক ঢোকে সাবাড় করে দিয়েছি—'

অ্যালবার্ট চমকে ওঠে। বলে, 'বোতলের রঙটা খেয়াল করেছিলে?'

'আধো-অন্ধকারে কি আর রঙ্ চেনা যায়?' লিওনার্ডের কথায় তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি। 'দরজার পাশেই তো পড়ে আছে খালি বোতলটা—দেখো না গিয়ে।'

নীল রঙের কাচের বোতল। ঘরের বাইরে ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে বোতলটাকে খুব সাবধানে হাতে নেয় অ্যালবার্ট।

'আরে এটা তো বেশ ভারী, দেখছি।' অ্যালবার্ট বলে ওঠে।

'ধ্যাৎ, তা কী করে হবে? আমি তো পুরো বোতলটাই খালি করে দিয়েছি। দাও তো দেখি।'

বোতলটা হাতে নিয়ে আবার গলায় উপুড় করে লিওনার্ড। গলা দিয়ে পানীয় নেমে যাওয়ার ঢকঢক শব্দ, চারপাশে মৃদু সুগন্ধ—

'আশ্চর্য! খালি বোতলটা আপনাআপনি আবার ভরে গেল কী করে?' অ্যালবার্টের দিকে বোতলটা এগিয়ে দেয় ও।

'তুমি কি এখনোও বুঝতে পারোনি, এটাকেই আমরা অ্যাদ্দিন ধরে খুঁজে বেড়িয়েছি?' পরম যত্নে বোতলটার গায়ে হাত বোলাতে থাকে অ্যালবার্ট; আর ঠিক তখনই যেন কার পায়ের শব্দ কানে আসে।

'মশাইরা, এদিকে একটু দেখবেন?'

চমকে উঠে দুজনেই পেছন ফেরে। ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে ষণ্ডা চেহারার একটা লোক—কুতকুতে চোখে তাকিয়ে আছে ওদের দুজনের দিকে! লোকটার হাতে ধরা অস্ত্রটা দুজনেরই অচেনা।

BanglaBook.org

'আমায় ক্ষমা করবেন,' অচেনা মানুষটির ঠোঁটে মৃদু হাসি, 'আসলে, এসব বন্দুক-টন্দুক ধরতে আমার একটুও ভালো লাগে না। নেহাৎ আপনাদের হাতের ওই বোতলটা আমার না পেলেই নয়। ওটাকে অনেকদিন ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছি কিনা—'

অ্যালবার্টের মনটা ভারী হয়ে ওঠে। বোতলটা হাতে এল, অথচ তার রহস্যটুকু বের করার আগেই তা খোয়াতে হচ্ছে! কিন্তু উপায়ই বা কী? আস্তে আস্তে হাত বাড়িয়ে বোতলটা এগিয়ে দেয় আগন্তুকের দিকে।

'সত্যি, এত সহজে যে কাজটা হাসিল হবে, ভাবতেই পারিনি।' অ্যালবার্টের হাত থেকে বোতলটা নেওয়ার সময় বিড়বিড় করে বলে ওঠে লোকটা। তারপর নিমেষের মধ্যে ফটকের বাইরে উধাও হয়ে যায়।

মাঝরাতে জঙ্গলের ভেতর জোড়া-চাঁদের আবছা আলোয় পুরনো জীর্ণ শহরটাকে ধুলোবালির ঢিপির মতো দেখায়। ক্ষতবিক্ষত রাস্তা ধরে গাড়িটাকে সন্তর্পণে চালাতে চালাতে লিওনার্ড বলে, 'লোকটা যখন সাইকেল চেপে পালাল তখনই জানি, ওর আর টিকি ছুঁতে পারছি না আমরা।'

'দাঁড়াও তো হে। রাস্তার ধারে কী যেন একটা দেখলাম বলে মনে হল।' অ্যালবার্ট বন্ধুর পিঠে আলতো করে চাপড় মারে।

লিওনার্ড গাড়ি পিছিয়ে আনে। অ্যালবার্টের টর্চের তীক্ষ্ণ আলো এসে পড়ে রাস্তার ধারে ঝোপঝাড়ের গায়ে।

অল্প দূরে ছোট একটা খাদের মধ্যে সাইকেল-আরোহীর দেখা মেলে। সাইকেলটা পড়ে আছে মাটিতে, পাশেই শুয়ে আছে লোকটা; চোখ দুটো খোলা। টর্চের আলো পড়ার পরেও সে চোখের মণি অনড়-নিশ্চল!

লিওনার্ডই প্রথম এগিয়ে যায় লোকটির দিকে।

'অনেকক্ষণ আগেই তো মারা গেছে, দেখছি। তা, বোতলটা গেল কোথায় বলো তো?'

অ্যালবার্টকে চিন্তিত দেখায়। চারপাশের জমির ওপর টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে বলে, 'আশ্চর্য, বোতলটা উধাও! লোকটা মারা গেছে, অথচ গায়ে এক ফোঁটা আঘাতের চিহ্ন নেই!'

'লোকটাকে মারল কে?'

'বুঝতে পারছি না।'

'দেখো, দেখো—দূরে ওই মাঠের ওপর দিয়ে কারা যেন ছুটে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না?' লিওনার্ড আঙুল তুলে দেখায়।

BanglaBook.org

'সত্যিই তো!' অ্যালবার্টও দেখতে পায়।

ঠিক তক্ষুনি পেছন থেকে একটা চিড়বিড় শব্দ কানে আসে। অবাক হয়ে ওরা দেখে—মৃত লোকটার শরীর থেকে আলোর আভা ফুটে বেরুচ্ছে! মাথার চুলগুলো খাড়া; চিড়বিড় আওয়াজটা আসছে ওখান থেকেই। পট্‌কা ফাটলে যেমনটা শোনায়। ....কয়েক মুহূর্তের মধ্যে গোটা মৃতদেহটা ফেটে চৌচির হয়ে যায়! শরীরটা গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে হাল্কা ধুলোর মতন মিলিয়ে যায় বাতাসে!

'এ নিশ্চয়ই ওই শয়তানগুলোর কীর্তি! নতুন ধরনের কোনো অস্ত্রটস্ত্র জোগাড় করেছে নিশ্চয়ই!' উত্তেজিতভাবে বলে ওঠে লিওনার্ড।

অ্যালবার্টের দৃষ্টি উদাস। বলে, 'বোতলটা সম্পর্কে শুনেছিলাম, ওটা নাকি যাদের হাতেই গেছে তারা সবাই অল্পদিনের মধ্যে একেবারে উবে গেছে!'

গাড়ির দিকে এগোচ্ছিল অ্যালবার্ট। লিওনার্ড বলে, 'কী করতে চাইছ, বলো তো?'

'লোকগুলোকে ধরা দরকার।' শান্তগলায় জবাব দেয় অ্যালবার্ট।

'এই এবড়ো-খেবড়ো মাঠের ওপর দিয়ে তুমি গাড়ি চালাবে?' লিওনার্ডের চোখে বিস্ময়। 'যাক্‌গে, তুমি তোমার বোতলের পেছনে ছোটো। আমি বাবা আর এখান থেকে এক পা-ও নড়ছি না।'

'বেশ, আমি একাই যাচ্ছি।' চকিতে গাড়িতে উঠে স্টার্ট দেয় অ্যালবার্ট। 'তুমি এখানেই দাঁড়াও। আমি বোতলটা নিয়ে ফিরে আসছি।'

চারদিকটা যেন বড় বেশি ঠান্ডা। গাড়ির ইঞ্জিনটা বন্ধ করতে গিয়ে অ্যালবার্টের হঠাৎই মনে হয়, দূরে বালিয়াড়িতে তিনটে ছায়ামূর্তি একেবারে স্থির নিশ্চল।

অ্যালবার্ট চুপিসাড়ে এগিয়ে চলে ছায়াগুলোর দিকে। এ লোকগুলোও শুয়ে আছে পাশাপাশি। একটু দূরেই পড়ে আছে সেই বোতলটা। পা টিপে টিপে এগিয়ে গিয়ে বোতলটাকে হাতে নেয় অ্যালবার্ট। ঠিক তক্ষুনি এক বিকট আওয়াজ করে মৃতদেহ তিনটে ছিটকে যায় বাতাসে। তারপর সেই শরীরগুলো ধুলোর মতো গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে বাতাসে মিশতে থাকে—ঠিক যেমনটা অ্যালবার্ট দেখে এসেছে একটু আগেই।

'কোনো নতুন ধরনের অস্ত্র'—লিওনার্ডের কথাগুলো ওর কানে বাজতে থাকে। উঁহু, নতুন কোনো অস্ত্র নয়—ওই বোতলটাই যে লোকগুলোর অকালমৃত্যুর জন্য দায়ী তা বুঝতে আর কষ্ট হয় না অ্যালবার্টের। সঙ্গে সঙ্গে কত না প্রশ্ন এসে ভিড় করতে থাকে মনের মধ্যে। তাহলে কি ওই সব অসুখী-অতৃপ্ত মানুষগুলি মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষায় দিন গুনছিল? গত হাজার হাজার বছর

BanglaBook.org

ধরে মানুষ কি শুধুমাত্র মৃত্যুর কামনায় এই বোতলের পেছনে ঘুরে বেড়িয়েছে? সব মানুষের মধ্যেই কি মৃত্যুর প্রতি একটা সুপ্ত আকর্ষণ থাকে?

না, সবার নয়। অ্যালবার্ট বেশ বুঝতে পারে। আসলে, এই দুনিয়ায় আবার লিওনার্ড ক্রেগের মতন লোকও রয়েছে যারা কোনো কিছুতেই কখনও বিস্মিত হয় না, বিচলিত হয় না।

অ্যালবার্ট বোতল ঝাঁকায়। পরম পরিতৃপ্তিতে ওটাকে চেপে ধরে বুকের মধ্যে। ওর মনে হয়—এতদিনের সব ক্লান্তি যেন দূর হয়ে যাচ্ছে!

জীবনে এই প্রথম সত্যিকারের সুখের সান্নিধ্য পায়ও। আর ঠিক তখনই ওর হাত থেকে বোতলটা গড়িয়ে পড়ে মাটিতে।

ভোরের আলো আকাশে ফুটতেই রাস্তা থেকে মাঠে নেমে আসে লিওনার্ড। আশ্চর্য, সারা রাতের মধ্যেও ফিরে এল না অ্যালবার্ট! বোতলটার জন্য শেষ পর্যন্ত লোকটা সত্যি সত্যি পাগল হয়ে গেল নাকি?

খানিক এগোতেই মাঠের ওপর রোদের আলোয় বোতলটাকে চক্‌চক্ করতে দেখে লিওনার্ড। এগিয়ে গিয়ে হাতে তুলে নিয়ে দেখে, সুগন্ধী পানীয়তে আবার দিব্যি ভর্তি হয়ে আছে ওটা!

'অ্যালবার্ট, কোথায় তুমি? শিগগির এসো।' তারস্বরে চেঁচাতে থাকে লিওনার্ড। 'এই দেখো, তোমার প্রিয় বোতল।'

না, চারদিক নিস্তব্ধ। যদ্দূর দৃষ্টি চলে—অ্যালবার্টের কোনো চিহ্ন নেই।

'সত্যি, কোথায় যে গেল হতচ্ছাড়াটা?' পাথরের ওপর বসে দুপাশে পা ছড়িয়ে দেয় লিওনার্ড। 'কতক্ষণ এখানে অপেক্ষা করতে হবে কে জানে?'

বলেই গলার মধ্যে বোতলটাকে আবার আগের মতো উপুড় করে ধরে ও।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

গাধা

আইজ্যাক অ্যাসিমভ

টেবিলের ওপর বিশাল এক জাবদা খাতা—তারই একটা খোলা পাতার দিকে উদাস দৃষ্টি বসে ছিল 'নারোন'—আর্ন্তনাক্ষত্রিক খবর আদান-প্রদানের মূল কেন্দ্রের সবচেয়ে পুরনো কর্মী। ওর কাজটা একঘেয়ে হলেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ছায়াপথের কোনো তারকা-পরিবারের কোনো গ্রহে বা উপগ্রহে বুদ্ধিমান প্রাণীর উদ্ভব হচ্ছে, তার হিসেব রাখতে হয় ওই জাবদা খাতায়; হিসেবে একটু ভুলচুক হলেই মুশকিল! নারোন মাঝেমাঝেই ভেবে অবাক হয়—এই ছায়াপথের কোটি কোটি গ্রহ-উপগ্রহের প্রায় সবই নিষ্প্রাণ! সবশেষ খবর অনুযায়ী, মাত্র ঊনত্রিশ হাজারের কিছু বেশি গ্রহ বা উপগ্রহে প্রাণীর বেঁচে থাকার পরিবেশ তৈরি হয়েছে, অর্থাৎ, এসব জায়গায় উষ্ণতা সহ্যসীমার মধ্যে। প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য অক্সিজেন, জল আর কোনো একটা নক্ষত্রের তাপ এবং আলো—এসবও রয়েছে প্রয়োজনীয় মাত্রায়। তবে হ্যাঁ, এই ঊনত্রিশ হাজারের মধ্যে বহু গ্রহেই প্রাণধারণের অনুকূল পরিবেশে প্রাণীর উদ্ভব হয়ে থাকলেও প্রাকৃতিক, জীবরাসায়নিক কিংবা সামাজিক কোনো বিপর্যয়ে প্রাণের বিকাশ চিরকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেছে। এরকম কোনো খবর এলে নারোনকে ওই খাতাটা থেকে সেই গ্রহের নামটা কেটে বাদ দিতে হয়। এছাড়াও আর একটা হিসেব রাখতে হয় ওকে। যেসব গ্রহের বুদ্ধিমান প্রাণীরা বুদ্ধির বিকাশের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণতায় পৌঁছেছে, সেইসব গ্রহের নামগুলো জাবদা খাতা থেকে তুলে নিয়ে পাশের একটা ছোট খাতায় লিখতে হয়ে ওকে। ছোট খাতাটায় এ যাবৎ যেসব গ্রহ-উপগ্রহের নাম উঠেছে সেখানকার অধিবাসীরাই একসময় এই আর্ন্তনাক্ষত্র-কেন্দ্র গঠন করেছিল। নারোন মাঝেমাঝেই খাতাটা উল্টে দেখে। ওখানে নাম উঠেছে—এমন জায়গার সংখ্যা এখনোও বড় কম। তবে একবার কোনো নাম ওই ছোট খাতায় তোলার পর তা যে আর কেটে দিতে হয় না—এই যা বাঁচোয়া। বুদ্ধির পরিপূর্ণ বিকাশ হয়েছে বলেই, যে কোনোরকম বিপর্যয় থেকে নিজেদের সভ্যতাকে বাঁচানোর কৌশল আয়ত্ত্ব করেছে ওইসব গ্রহ-উপগ্রহের অধিবাসীরা।

নারোনের হঠাৎ খেয়াল হয়, ওর সামনেই এসে দাঁড়িয়েছে 'ইখুর'—নারোনের কাছে খবর পৌছে দেওয়াই ওর কাজ।

'নতুন খবর আছে নাকি?'

'হ্যাঁ। আর একদল বুদ্ধিমান প্রাণী তাদের বুদ্ধিবৃত্তির পূর্ণতায় পৌঁছেছে।'

'তাই নাকি? খুব ভালো কথা।' নারোন জাবদা খাতাটা কাছে টেনে নেয়। 'ওদের বাসস্থানের বিবরণ দাও।'

'আমাদের ছায়াপথের দ্বিতীয় গলি-র ২ঃ১১৮ নক্ষত্রের তৃতীয় গ্রহে ওই বুদ্ধিমান প্রাণীরা বসবাস করে।' ইখুর ওর হাতের কাগজের দিকে তাকায়। 'ওইসব প্রাণীদের ভাষায়, ওদের গ্রহের নাম 'পৃথিবী' আর যে নক্ষত্রকে তা আবর্তন করে চলেছে তার নাম 'সূর্য'।'

নারোন বড় খাতাটার পাতা ওলটাতে ওলটাতে 'পৃথিবী' সংক্রান্ত তথ্যগুলি খুঁজে পেয়ে বলে, 'এই তো দেখছি—পৃথিবী ছাড়া সূর্যের বাকি সমস্ত গ্রহই নিষ্প্রাণ! অবশ্য ভবিষ্যতে পৃথিবীর ঠিক আগে পরের দুটো গ্রহে প্রাণধারণের পরিবেশ গড়ে ওঠা একেবারে অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু আমি তো কিছুতেই বুঝতে পারছি না—পৃথিবীর বুদ্ধিমান প্রাণীরাই বা এত কম সময়ের মধ্যে বুদ্ধির পূর্ণতায় পৌঁছল কী করে? ভাবতে পারো, ওদের হিসেবে মাত্র শ-খানেক বছর আগেও ওরা বৈদ্যুতিক আলোর কথা জানত না? ওরা যে দেখছি, একটা রেকর্ড করে ফেলল!'

ইখুর উত্তর দিল না। নারোন পুরনো খাতাটা থেকে পৃথিবীর নাম আর খুঁটিনাটি বিবরণ কেটে দিয়ে পরিষ্কার করে আবার তা ছোট খাতাটায় লিখে ফেলল। তারপর ইখুরের দিকে চেয়ে বলল, 'ভালো কথা, আমাদের পর্যবেক্ষণকারীরা কোনো ভুলটুল করে বসেনি তো? পৃথিবীর বুদ্ধিমান প্রাণীদের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির কথা একটু খুলে বলো তো, শুনি।'

ইখুর হাতে ধরা কাগজটা থেকে রিপোর্ট পড়ার ঢঙে বলতে শুরু করে,'পৃথিবীর বুদ্ধিমান জীব এখন মহাকাশ অভিযানে সক্ষম। ওদের যে একটিমাত্র উপগ্রহ রয়েছে সেখানে বেশ কয়েকবার ওরা অভিযাত্রীদের পাঠিয়েছে, তাছাড়া ওরা অভিযান চালিয়েছে নিজেদের নক্ষত্র-পরিবারের বেশ কয়েকটা গ্রহে। আবহাওয়ার পূর্বাভাষ, টেলি যোগযোগ ইত্যাদির কাজে ওরা ইতিমধ্যেই বেশ কতকগুলি কৃত্রিম উপগ্রহকে কাজে লাগিয়েছে। সম্প্রতি ওরা মহাকাশ-ফেরি চালু করতে সক্ষম হয়েছে।'

'বাঃ, বাঃ,' নারোনের গলায় খুশির সুর। 'ওরা নিশ্চয়ই আমাদের এই আন্তর্নাক্ষত্র কেন্দ্রের সঙ্গেও যোগযোগের চেষ্টাও নিশ্চয়ই করেছে?'

'না, তা অবশ্য করেনি।' ইখুর জবাব দেয়। 'তবে ইতিমধ্যেই ওরা 'পাইওনিয়ার' নামে একটা মহাকাশযান দূর মহাকাশে পাঠিয়েছে যা পাড়ি দিচ্ছে

BanglaBook.org

সূর্যের কাছাকাছি ২ঃ১৩৪ নক্ষত্রের দিকে। পৃথিবীর প্রাণীরা ওই নক্ষত্রকে চেনে 'রোহিনী' নামে।'

'ওহ্, তবে তো আমাদের সঙ্গেও যোগাযোগ হল বলে!' নারোন উৎফুল্ল-স্বরে বলে ওঠে। 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দিক থেকে ওরা যে সত্যিই সাবালকত্ব অর্জন করেছ তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই।'

ইখুর চুপ করে শুনে যায়। সাধারণত কোনো ব্যাপারেই ও মতামত দেয় না। ওর কাজ হল শুধু খবর পৌঁছে দেওয়া। নারোন ছোট খাতাটা বন্ধ করতে করতে জিজ্ঞাসা করে, 'ওরা নিশ্চয়ই শক্তির চাহিদা মেটাতে ওদের নক্ষত্রের আলো এবং তাপকে ব্যবহার করে?'

ইখুর মাথা নাড়ে। বলে, 'না। সূর্যের শক্তিকে কাজে লাগানোর কথাটা ওরা সবে ভাবতে শুরু করেছে।'

নারোন অবাক হয়। বলে, 'তাহলে কীভাবে ওরা ওদের খাবার দাবার বানায়. ওদের যানবাহনই বা চলে কী করে?'

'বলতে গেলে, ওদের গ্রহের অভ্যন্তরে সঞ্চিত কয়লা আর জ্বালানী তেলই ওদের শক্তির প্রধান উৎস;

'তার মানে তো হাইড্রোকার্বন?' নারোনকে হঠাৎ খুব চিন্তিত দেখায়। 'হাইড্রোকার্বন পুড়ে বাতাসে মেশার ফলে ওখানাকার বাতাস তো প্রতিনিয়ত দূষিত হচ্ছে!'

'হ্যাঁ, তাই হচ্ছে,' ইখুর নিরুত্তাপ কণ্ঠে উত্তর দেয়, 'তবে ইদানীং ওরা পরমাণুশক্তিকে কাজে লাগানোর কিছু কিছু চেষ্টা চালাচ্ছে।'

ইখুরের কথায় নারোন যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। বলে, 'ওরা যখন মহাকাশযান তৈরি করতে সক্ষম তখন ওদের গ্রহের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাওয়ার জন্য নিশ্চয়ই দ্রুতগতির আকাশযান ব্যবহার করে?

'হ্যাঁ। ওরা ইতিমধ্যেই শব্দের চেয়েও দ্রুতগামী আকাশযানের ব্যবহার শুরু করেছে।'

'শব্দের চেয়ে দ্রুতগতির আকাশযান তো চালাতে হয় আবহমণ্ডলের ওপরের অংশে। অন্তত এগুলো ওরা পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে চালায়, নিশ্চয়ই?'

ইখুর আবার মাথা নাড়ে। বলে, 'না। এক্ষেত্রেও সেই জ্বালানী তেলই........।'

নারোন চমকে ওঠে, উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'তার মানে, কার্বন মনোক্সাইড, কার্বন ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, সালফার ডাইঅক্সাইড এই সব ছড়িয়ে পড়ছে ওদের আবহমণ্ডলের ওপরের স্তরে, অর্থাৎ স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে? কী সাংঘাতিক! তাহলে তো ওদের আবহমণ্ডলের ওপরে

BanglaBook.org

'ওজোন'-এর পরিমাণ ক্রমেই কমে যাচ্ছে! আচ্ছা, ওইসব বুদ্ধিমান প্রাণীরা কি জানে না—ওজোন-স্তরই আসলে সূর্য থেকে বেরিয়ে আসা অতিবেগুনি রশ্মি এবং অন্যান্য ক্ষতিকর মহাজাগতিক রশ্মির হাত থেকে ওদের বাঁচিয়ে রেখেছে? ওরা কি বোঝে না—ওদের গ্রহকে ঘিরে থাকা ওজোন-এর স্তর ক্রমশ পাতলা হয়ে যাওয়ার ফলে শিগগিরই ওদের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে চলেছে?'

'সম্ভবত বোঝে,' ইখুর আস্তে আস্তে উত্তর দেয়, 'তবে যতদিন ওদের গ্রহের ভেতরকার সঞ্চিত জ্বালানী তেল একেবারে ফুরিয়ে না যায় ততদিন বোধহয় ওরা অন্য কোনো ব্যবস্থা নেবে না। ওদের বিজ্ঞানীরা এখনোও শক্তির নতুন উৎস খুঁজে বের করার চেয়েও জ্বালানী তেলের নতুন উৎস খোঁজার ব্যাপারটাকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে।'

ইখুরের হাত থেকে কাগজটা টেনে নেয় নারোন। কাগজটায় চোখ বুলিয়ে মনে মনে কী সব হিসেব-টিসেব করে। তারপর বলে, 'এ তো দেখছি—যে হারে ওখানে ওজোন-এর পরিমাণ কমছে—তাতে ওদের অন্তিম অবস্থা আসতে আর দেরি নেই। কী অদ্ভুত! একদিকে ওরা বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছে, বিজ্ঞান ও কারিগরিতে উন্নতির চূড়ায় উঠছে—অথচ নিজেদের বোকামির জন্য যে ধ্বংস হতে চলেছে, সে খেয়ালই নেই!'

বিরক্ত-মুখে নারোন আবার ছোট খাতাটা টেনে নেয়। পাতা ওলটাতে ওলটাতে ঠিক সেই জায়গাটায় আসে যেখানে একটু আগেই পৃথিবীর নাম ও বিবরণ লিখেছে। তারপর, ভবিষ্যৎদ্রষ্টার প্রত্যয় নিয়ে ও পৃথিবীর নামটা কেটে দেয়। এই প্রথম ওই খাতাটা থেকে কোনো গ্রহের নাম কাটতে হয় ওকে। ওর চোখে মুখে হতাশা আর বিষণ্ণতা চাপা থাকে না। মুখে শুধু ও শেষবারের মতো বিড়বিড় করে বলে ওঠে, 'গাধার দল!'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

বাবার স্ট্যাচু

আইজ্যাক অ্যাসিমভ

‘এই যে স্যার, আপনি বুঝি প্রথম এলেন এখানে? সত্যি? নিশ্চয়ই আমাদের কথা আগে শুনেছেন—তাই না?

‘আপনি যদি সেই বিখ্যাত আবিষ্কারের বিষয়ে জানতে সত্যিই আগ্রহী হন, বিশ্বাস করুন—আপনাকে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলতে আমার খুবই ভালো লাগবে। আসলে ঘটনাটা আমি সবাইকেই বলে থাকি।

‘ঘটনাটার নায়ক আমার নিজের বাবা এবং তিনি প্রমাণ করেছেন যে স্রেফ নিজের কৌতূহল মেটানোর জন্য অনুসন্ধান চালিয়ে গেলেও অনেকসময় এমন কিছু খুঁজে পাওয়া যায় যা গোটা মানবজাতির উপকারে আসে।

‘আপনি স্যার, অধৈর্য হবেন না। আপনি যে স্পেশাল খাবারের অর্ডারটা দিয়েছেন, সেটা আপনার টেবিলে এসে পৌঁছনোর আগেই আপনাকে পুরো ঘটনাটা আমি বলে উঠতে পারব। আসলে, আপনার ওই স্পেশাল জিনিসটা বানাতে আমার এই রেস্টুরেন্টের রাঁধুনি আধ ঘণ্টাটাক সময় নেবে। আপনি নতুন খদ্দের বলেই একটু বাড়তি যত্ন নিচ্ছে আর কী!

‘তা সে যাক্ গে। বাবার কথা বলছিলাম। আমার বাবা ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, এবং সেই কারণেই আর্থিক অবস্থা মোটেই ভালো ছিল না। পরে অবশ্য অনেক টাকাপয়সা করেছিলেন। সত্যি বললে, মৃত্যুর আগে তিনি এত টাকা করে গেছেন যে আমার এবং আমার ছেলেমেয়েদের কখনও খাওয়া-পড়ার চিন্তা করতে হবে না!

‘আমাদের এই শহরের লোকেরা মোটেই অকৃতজ্ঞ নয়। সবাই মিলে চাঁদা দিয়ে বাবার একটা মূর্তি তৈরি করিয়েছিল। আপনি জানলা দিয়ে এখন সেটা দেখতেও পাচ্ছেন।

‘আসলে আমার বাবা ‘সময়-পরিভ্রমণ’ নিয়ে গবেষণা করতেন। না, ঠিক টাইম-মেশিন বানানোর চেষ্টা উনি করেননি। ওটা সম্ভবও নয়। উনি কাজ করেছিলেন ‘ক্রোনো-ফানেল’ নিয়ে। বিষয়টা সম্পর্কে আপনার বোধহয় তেমন কোনো ধারণা নেই। সেটাই স্বাভাবিক।

BanglaBook.org

'অবশ্য ব্যাপারটা যে আমি নিজেও ভালো বুঝি, তা নয়। এটুকু শুধু জানি, একটা বড়সড় চোঙা বা ফানেলের গায়ে অসংখ্য ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি থাকে, ফানেলের ভেতরে ঘন ঘন বিদ্যুতের স্পার্ক দেখতে পাওয়া যায়, এবং অনেক পদার্থবিদের ধারণা—ফানেলের এক প্রান্ত যখন বর্তমানে, তখন অন্যপ্রান্তে অতীতের জিনিস ভেসে ওঠে।

'আমার বাবা মেতে উঠেছিলেন ওই 'ক্রোনো-ফানেল' নিয়ে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটা বড়সড় অনুদান জোগাড় করে কাজ শুরু করেছিলেন। অনুদানের টাকায় নিজেই যন্ত্রপাতি কিনে চোঙা জাতীয় সেই অদ্ভুত জিনিসটা তৈরি করে নিয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাবার নিজস্ব একটা ল্যাবরেটরি ছিল। সেখানেই দিনরাত সেই চোঙার এক প্রান্তে বসে তিনি হাজারটা সুইচ গিয়ার নাড়াচাড়া করতেন।

'প্রথম প্রথম বাবার বন্ধুবান্ধব—ছাত্ররা ল্যাবরেটরিতে ঢুকে ফানেলের এক প্রান্তে চোখ রেখে অন্যপ্রান্ত দেখার চেষ্টা করত। কিছুই দেখা যেত না, কারণ চোঙার মাঝখানটা ছিল প্যাঁচানো স্ক্রু-র মতো। আস্তে আস্তে লোকের উৎসাহ কমে গেল। বাবাকে আমি প্রায়ই বোঝাতাম—ওই কিম্ভুত-কিমাকার চোঙার পেছনে সময় নষ্ট না করে অন্য কোনো বিষয়ে গবেষণা শুরু করাই ভালো।

'বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আর যে অনুদান পাওয়া যাবে না সেটাও বাবা জেনে গিয়েছিলেন। বর্তমান থেকে অতীত ফিরে যাওয়া যে কোনোমতেই সম্ভব না, সেটা কর্তৃপক্ষ একসময় খোলাখুলি জানিয়ে দিয়েছিল। সে কথা শুনে বাবা খুব মুষড়ে পড়েছিলেন।

'ইতিমধ্যে আমি অবশ্য সংসারী হয়েছি। বিয়ে করেছি, ছেলেমেয়ে হয়েছে। চাকরি নিয়ে প্রায়ই আমায় বাইরে বাইরে ঘুরতে হত। তবু তার মধ্যেও সময় সুযোগ পেলে ল্যাবরেটরিতে গিয়ে বাবার কাছে বসতাম। কখনও সখনও চোখ রাখতাম চোঙার গহ্বরে।

'ওইসময় হঠাৎ একদিন বাবা চেঁচিয়ে উঠেছিলেন। তাই শুনে ছুটে গিয়ে বাবার পাশে দাঁড়িয়ে চোঙার ভেতরে চোখ রেখে অন্যপ্রান্তে কিছু অদ্ভুত-দর্শন জন্তু-জানোয়ারকে চলতে ফিরতে দেখলাম! বাবা বলছিলেন, 'ভালো করে দ্যাখ, ওগুলো সব লক্ষ লক্ষ বছর আগেকার জীব। দেখলি তো, চেষ্টা করলে অতীতকে আবার ফিরে পাওয়া যায়!'

'আমি হাঁ করে তাকিয়ে ছিলাম। নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না।

'বাবা খুট্‌খাট্ করে নানাধরনের সুইচ-টুইচ নাড়ানাড়ি করছিলেন। তার জন্যই কিনা কে জানে, হঠাৎ একসময় ফানেলের ভেতরটা আলোয় ভরে গেল। মনে

BanglaBook.org

হল, ও প্রান্ত থেকে সূর্যের আলোয় ভেতরটা যেন ঝলসে উঠেছে! বাবা আমার কানে ফিসফিস করে বললেন, 'কীরে, ভেতরে ঢুকবি?'

'বাবার কথায় চমকে উঠেছিলাম।

'আমায় চুপ করে থাকতে দেখে বাবা বলেছিলেন, 'আমার এই ভারী শরীর নিয়ে তো আর এই চোঙার ভেতরে হামাগুড়ি দেওয়া সম্ভব নয়, তাই তোকে ঢুকতে বলছি।'

'বাবার কথায় আমি ধাঁ করে চোঙার ভেতরে ঢুকে পড়লাম এবং হামাগুড়ি দিয়ে কোনোরকমে অন্যপ্রান্তে পৌঁছে দেখলাম—একতাল পাথুরে মাটির ওপরে চোদ্দখানা ডিম পরপর সাজানো। আকারে ওগুলো রাজহাঁসের ডিমের চেয়েও ঢের বড়। বাবার গলা শুনতে পেলাম—'অমন বোকার মতন বসে না থেকে ওগুলো নিয়ে ফিরে আয়।'

'এতক্ষণে স্যার, নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন—আমি একটু পিতৃভক্ত টাইপ। আমার যদিও খুব ইচ্ছে করছিল—চোঙার ও-প্রান্তে অতীতের পৃথিবীটাকে ভালো করে খুঁটিয়ে দেখি, তবু বাবার কথা অমান্য করিনি। গায়ের শার্টটা খুলে তার মধ্যে ডিমগুলোকে বেঁধে ফিরে এসেছিলাম বাবার কাছে।

'চোঙা থেকে লাফিয়ে নামার সময় কোথাও ধাক্কা টাক্কা লেগে থাকবে—চোঙার ভেতরটা আবার আগের মতো অন্ধকার হয়ে গেল।

'বাবা অবশ্য দমবার পাত্র নন। বললেন, 'একবার যখন পেয়েছি তখন আবার নিশ্চয়ই সুইচ আর সার্কিটগুলোকে ঠিক্‌ঠাক করে নিয়ে অতীতকে দেখতে পাব। তোর লাগে টাগেনি তো?'

'ডিমগুলোকে টেবিলের ওপর সাজিয়ে রেখে আমি আর বাবা সেগুলির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। বাবা একসময় বললেন, 'মনে হচ্ছে এগুলি সব ডাইনোসরের ডিম।'

'ডিম ফুটে বাচ্চা বেরুনোর পরই সেটা বোঝা যাবে।' আমি বিজ্ঞের মতো বলে উঠেছিলাম।

'তারপর বেশ কিছুদিন সব কিছু শিকেয় তুলে আমি আর বাবা লেগে পড়লাম অন্য কাজে।

'একটা বড়সড় কাচের বাক্সের মধ্যে ডিমগুলো রাখা হল। বাক্সের ভেতরে একটা বালব্ জ্বালিয়ে দেওয়া হল যাতে ডিমগুলোর চারপাশটা সবসময় গরম থাকে। নলের মধ্যে দিয়ে বাক্সের মধ্যে জলীয়বাষ্প-মেশানো বাতাস ঢোকানোর ব্যবস্থা করলেন বাবা। ঠিক উনিশ দিন বাদে রাত তিনটের সময় ডিমগুলো

BanglaBook.org

ফুটে বাচ্চা বেরুলো। চোদ্দখানা কদাকার জীব! দেখতে অনেকটা ক্যাঙারুর ছানার মতন, তবে গোটা শরীরটা শক্ত আঁশ দিয়ে ঢাকা, পেছনে সরু লম্বা লেজ!

‘আমার মনে হয়েছিল, ওগুলো সব টিরানোসেরাস—তবে আকারে খুবই ছোট। বাবা বললেন, ‘খবরদার! একথা যেন পাঁচকান না হয়। লোকে যদি একবার শোনে, ডাইনোসরের বাচ্চারা অতীত থেকে সব বর্তমানে ফিরে এসেছে, তবে আমার গবেষণার বারোটা বাজবে! তার চেয়ে তুই বরং ডাইনোসরের এই ছানাপোনাগুলোকে সামলা, আমি আবার ক্রোনো-ফানেল নিয়ে বসি।’

‘বাবার কথামতোই কাজ হল। আমি ওইসব অদ্ভুত প্রাণীগুলোর ওপর নজর রাখতে শুরু করলাম, আর বাবা আবার চোঙার একপ্রান্তে চোখ রেখে অতীতকে ফিরে পাওয়ার চেষ্টায় মাতলেন।

‘ডাইনোসরের ছানাগুলোর মধ্যে দু’টো অবশ্য জন্মের পরেই অক্কা পেয়েছিল, বাকি বারোটাকে রীতিমতো তোয়াজে রাখলাম, বলা যায়। ওদের খেতে দিতাম কচি গাজর, ডিমসেদ্ধ আর দুধ।

‘ক’দিনের মধ্যেই ওগুলো আমার রীতিমতো ন্যাওটা হয়ে পড়ল। ভারি নরম আর মিষ্টি স্বভাবের প্রাণীগুলো। তবে বুদ্ধি বলে কিছু ছিল না। বাবার ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতির মধ্যে নির্বোধের মতন ঘুরে বেড়াত।

‘তবে চেহারায় একইরকম থেকে গেল—এই সাধারণ কুকুরের সাইজ আর কি!

‘দিন কাটল। মাস গড়িয়ে নতুন বছর এলো। বাবার সেই ক্রোনো-ফানেলের ভেতরে কিন্তু একবারের জন্যেও অতীত আর ধরা দিল না।

‘এদিকে ডাইনোসরের ছানাগুলোর মধ্যে পাঁচটা ছিল স্ত্রী-জাতীয়। যথাসময়ে তারা আবার ডিম পাড়ল এবং সেগুলো ফুটে গাদাখানেক বাচ্চা বেরুল।

‘বাবার গোটা ল্যাবরেটরি জুড়ে তখন ডাইনোসরের বাচ্চাদের হুটোপাটি! বাবা একদিন বিরক্ত হয়ে বললেন, ‘এদের জ্বালায় তো আর পারিনে বাপু। তুই বরং এগুলিকে এবার মেরে ফেলার ব্যবস্থা কর।’

‘তাই কি করা যায়? ওগুলোর সঙ্গে থাকতে থাকতে ওদের আর মেরে ফেলার কথা তখন ভাবতেই পারি না। ওই সময় একদিন হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটল। ঘটনাটা আকস্মিকভাবে না ঘটলে আমাদের মানবজাতি বিজ্ঞানের একটা কতবড় আবিষ্কার থেকে যে বঞ্চিত হত, তা বোঝাতে পারব না।

‘যাক স্যার ওসব কথা। আপনার খাবারটা বোধহয় রেডি হয়ে এসেছে। আমি আর বেশি সময় নেব না। যে ঘটনার কথা বলছিলাম, সেটাই সংক্ষেপে বলে নিই—

BanglaBook.org

'আগেই বলেছি, ডাইনোসরের ছানাপোনাগুলি সংখ্যায় এত বেড়ে গেছিল যে আমি আর ওদের ঠিকমতো গুনে উঠতে পারতাম না। ল্যাবরেটরির ভেতরেই ওরা ঘুরে ফিরে বেড়াত। হঠাৎ একদিন একটা ছানা গিয়ে ঢুকে পড়ল ক্রোনো-ফানেলের মধ্যে। বাবা সেসময় ওখানে ছিলেন। না। কী থেকে যে কী হল! শর্ট-সার্কিট হয়েছিল বোধহয়। হঠাৎ তীব্র আলোর ঝলকানি, আর সেই সঙ্গে বিকট জোরে একটা শব্দ হল। তাকিয়ে দেখলাম—বাবার এতদিনের সাধের এক্সপেরিমেন্টের দফারফা হয়ে গেছে! ফানেলের চারপাশে পোড়া পোড়া গন্ধ। ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিগুলো সব ভেঙেচুরে মেঝেয় ছড়িয়ে পড়েছে, আর ফানেলের মুখেই স্থির-নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সব নষ্টের মূল— ডাইনোসরের সেই ছানাটা!

'আওয়াজ শুনে বাবা ছুটে এসেছিলেন। ঘরের ভেতরে ঢুকে চারদিকে তাকিয়ে কেমন থ মেরে গেলেন।

'বাবাকে কীভাবে সান্ত্বনা দেব বুঝতে না পেরে আস্তে আস্তে ডাইনোসরের মৃত ছানাটাকে দু'হাতে ধরে বাইরে নিয়ে এলাম। তড়িদাহত হয়ে ওর গোটা শরীরটা একেবারে ঝলসে গেছিল! গায়ে আলতো করে হাত বোলাতেই আঁশসুদ্ধ চামড়া দিব্যি উঠে এলো। ভেতরে লালচে-সাদা মাংসের স্তর। দেখেই রোস্ট করা মুরগির কথাটা মনে পড়ল।

'বিশ্বাস করুন, বাবার সমস্ত যন্ত্রপাতি আর এতদিনের গবেষণা ধুলোয় মিশে যেতে দেখে আমাদের তো দুঃখে ভেঙে পড়ার কথা, কিন্তু ডাইনোসরের ছানার ঝলসানো মাংস মুখে দিয়ে আমি আর বাবা সবকিছু ভুলে গেলাম। ওহো, কী তার স্বাদ! খানিকক্ষণ তো কথাই ছিল না আমাদের মুখে। শুধু হাঁউ-মাঁউ করে খেয়ে গেছি। শেষে হাড় ক'খানা ছাড়া আর কিছুই যখন পড়ে রইল না, তৃপ্তির ঢেকুর তুলে আমি বলেছিলাম, 'বাবা, ডাইনোসরের ছানার পোল্‌ট্রি করলে কেমন হয়? এমন সুস্বাদু মাংস পেলে লোকে আর কিছু মুখে দেবে না।'

'আমার কথায় বাবা রাজি হয়েছিলেন। না হয়ে অবশ্য উপায় ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান বন্ধ করে দিয়েছিল। নতুন করে ক্রোনো-ফানেল তৈরি করে গবেষণা শুরু করতে হলে বিস্তর টাকা চাই। 'ডাইনো-চিকেন'-এর ব্যবস্থাটা শুরু করা ছাড়া আমাদের আর পথ ছিল না।

'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। 'ডাইনো-চিকেন' নামটা আমারই দেওয়া।

'ডাইনো-চিকেনের পোল্‌ট্রি বানিয়ে কোটি কোটি টাকা রোজগার করেছিলেন বাবা। সারা দুনিয়ায় যত রেস্টুরেন্টে ডাইনো-চিকেনের প্রিপারেশন পাওয়া যায়,

BanglaBook.org

তাদের সবাইকে মাংসের জন্য শুধু আমাদের কাছেই অর্ডার দিতে হয়। মনোপলি ব্যবসা, বলতে পারেন।

'আপনার খাওয়া দাওয়া হলে চলুন, বাবার স্ট্যাচুটার কাছে যাব। স্ট্যাচুর গায়ে দেখবেন লেখা আছে ঃ এই সেই মহান ব্যক্তি যিনি পৃথিবীকে ডাইনো-চিকেন উপহার দিয়েছেন।

'এই যে স্যার, আপনার আইটেমটা এসে গেছে। ছুরি দিয়ে মাংসের এক টুকরো কেটে নিয়ে মুখে পুরে দেখুন—কী অদ্ভুত সুন্দর স্বাদ না?

'আমার সব চেয়ে বড় দুঃখটা কী জানেন? আবার বাবা মানবজাতির জন্য এত বড় একটা কাজ করলেন, অথচ জীবনের শেষ সময়টা উনি একটুও সুখ পাননি। ডাইনো-চিকেনের পোলট্রি থেকে অঢেল অর্থ রোজগার হতেই আবার নতুন করে গবেষণা শুরু করেছিলেন। কুড়িজন রিসার্চ-অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়েছিলেন, ক্রোনো-ফানেল আর অন্য সব যন্ত্রপাতির পেছনে জলের মতো টাকা খরচ করেছেন, কিন্তু কিছুতেই আর অতীতকে ফিরে পাননি। সময়-পরিভ্রমণের রহস্য যে কিছুতেই ভেদ করতে পারেননি—এই আক্ষেপ নিয়েই উনি মারা গেছেন!

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ক্রীতদাস

গ্লেব অ্যানফিলভ

সাইরেনের তীক্ষ্ণ শব্দ কানে আসতেই টেলিফোনের রিসিভারটা ঝট করে টেনে নিল স্প্যাস্কি। বাঁ-হাতের তর্জনী দিয়ে ফোনের ডায়াল ঘোরাতে ঘোরাতে ডান-হাতের আঙুল দিয়ে কারখানার নিরাপত্তার জন্য নির্দিষ্ট সুইচগুলোকে টিপে যাচ্ছিল ও।

রোবট-বিশেষজ্ঞ ভদ্রলোক ফোনটা ধরতেই চেঁচিয়ে উঠল স্প্যাস্কি, 'সর্বনাশ হয়ে গেছে এখানে! আমি কিচ্ছু করতে পারছি না।'

'কী, কী ব্যাপার?' রোবট-বিশেষজ্ঞ স্প্যাস্কির কথা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলেন না।

'আসলে, কারাখানায় একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে! ভেতরের দেয়ালে একটা ফাটল ধরেছে; সিলিকন তোড়ে বেরিয়ে আসছে তার মধ্যে দিয়ে।'

'সিলিকন বেরনোটা বন্ধ করা যাচ্ছে না?'

'বললাম যে, দেয়ালে একটা ফাটল দেখা যাচ্ছে—'

'তাহলে তো এক্ষুণি সেটা মেরামত করতে হয়।'

'তা তো বটেই। আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি—ওই ফাটলটা মেরামত করতে কি আমি 'এরেম'কে পাঠাতে পারি?'

'এরেম?' ভদ্রলোক কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলেন, 'ও কি পারবে? দেখুন—যা ভালো বোঝেন।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে 'মেরামতি যন্ত্র' চিহ্নিত সুইচে আঙুল রাখল স্প্যাস্কি। কয়েক সেকেন্ড পরেই দরজা খুলে এরেম এসে দাঁড়াল ঘরের ভেতরে। ওর চার-চারটে স্ফটিক-লেন্স প্রশ্নসূচক দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে রইল স্প্যাস্কির দিকে।

'আমাদের এই বিশাল 'ক্রিস্টালাইজার' যন্ত্রের সব ব্যাপার-স্যাপার তো তুমি জানো। ওটার দক্ষিণদিকের দেয়ালের একটা বিচ্ছিরি ফাটল দিয়ে গলন্ত সিলিকন বেরিয়ে আসছে', স্প্যাস্কি বোঝানোর চেষ্টা করে, 'তবে ঠিক কোথায় সে ফাটলটা তৈরি হয়েছে তা তোমায় বলতে পারছি না। আসলে তারগুলো পুড়ে গিয়ে টেলিভিশনটা কাজ করছে না—'

'ভেতরে গরমটা কেমন?' ক্যাঁচক্যাঁচে গলায় জিজ্ঞাসা করল এরেম।

'হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস। অবশ্য ওটা ক্রমশ বাড়ছে।'

'কতটা তরল রয়েছে ক্রিস্টালাইজারের মধ্যে?'

'দশলক্ষ টন। তাপ নিরোধক জিনিসপত্তর সব মেসিনের ভেতরে ঢোকার মুখে পাবে। এবার তাহলে ভেতরে ঢুকে পড়ো। তাড়াতাড়ি কাজটা সারতে হবে।'

এরেম ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতেই স্প্যাস্কি গা এলিয়ে দিল চেয়ারে, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাত বাড়াল সিগারেটের প্যাকেটের দিকে।

স্প্যাস্কি যখন সিগারেট প্রথম সুখটান দিতে যাচ্ছে, এরেম তখন যান্ত্রিক পদক্ষেপে ক্রিস্টালাইজারের মধ্যে ঢুকে দরজা দিয়েছে। ভেতরে ঢুকতেই আগুনের তীব্র হল্কা এসে গায়ে লাগে, ওখানকারই উষ্ণতা পাঁচশো ডিগ্রি সেলসিয়াস! এরেম প্রথমেই দেখে নিল—ওর বুদ্ধি এবং স্মৃতির জন্য নির্দিষ্ট স্ফটিক দুটি কাজ করছে কিনা। এর জন্য দু-সেকেন্ড অপেক্ষা করতে হল। তারপর একটু এগিয়ে আর একটা দরজা খুলে যন্ত্রের কেন্দ্রীয় অংশে পা রাখল ও। সামনে সিরামিকের দেয়াল—হাজার ডিগ্রি উষ্ণতায় তার রঙ টকটকে লাল। এরেম দেখল, মাথার ছাদ থেকে মিটার আষ্টেক নিচে দেয়ালের গায়ে একটা এবড়ো-খেবড়ো ফাটল, আর তা দিয়ে আগুনের ধারায় বেরুচ্ছে গলন্ত সিলিকন; অসংখ্য আগুনের ফুলকি ছিটকে যাচ্ছে চারদিকে!

'ফাটলটা দেখতে পেয়েছি।' রেডিও-টেলিফোনে খবরটা জানিয়ে দিল এরেম।

'বেশ বড়সড় নাকি?' জিজ্ঞাসা করে স্প্যাস্কি।

'এই মিটার তিনেকের মতো লম্বা।'

'কাজটা তাহলে শুরু করে দাও—'

শিরা-উপশিরার মতো অসংখ্য ধারায় ভারী তরল নেমে আসছে দেয়ালের গা বেয়ে। ওগুলোকে পেরিয়ে ফাটলের কাছে পৌঁছনো বেশ কঠিন। এক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়াল এরেম, তারপরই লম্বা সাঁড়াশির মতো যন্ত্রের সাহায্যে আগুন-নিরোধক তুলো টেনে আনল দরজার কাছ থেকে। এবারে ওকে ফাটলটার কাছে যেতে হবে। ওর পায়ের তলার যে যন্ত্রাংশটা ওকে লিফটের মতো ওপরে-তুলে দেবে সেটাকে শেষবারের মতো পরীক্ষা করে নিল এরেম। ফাটলের চারপাশের উষ্ণতা বারোশো ডিগ্রি! এরেম জানে, যে যন্ত্রপাতিগুলি নিয়ে ও কাজ করবে তাদের তাপ সহ্য করার ক্ষমতা আর মাত্র শ-খানেক ডিগ্রি বেশি। পায়ের তলার উত্তোলক-যন্ত্রটাকে চালু করল ও।

'ফাটলটার কাছে এবারে উঠছি;'

'তাড়াতাড়ি করো হে।' স্প্যাস্কি চিৎকার করে ওঠে।

BanglaBook.org

এরেমও জানে, ওর আরও তাড়াতাড়ি ফাটলটার কাছে পৌঁছনো দরকার, কিন্তু কিচ্ছু করার নেই। উত্তোলক-যন্ত্র ওই প্রচণ্ড তাপে ওকে মিনিটে তিন মিটারের বেশি তুলতে অক্ষম।

এরেমের শরীরের ওপরের দিকের দুটো যন্ত্রাংশ—যেগুলিকে অনায়াসেই ওর হাত বলে ধরে নেওয়া যায়, তাদের সাহায্যে মাঝে মাঝে দেয়ালে ভর দিচ্ছিল ও। যতই ওপরে উঠছিল, দেয়ালের গায়ে গলন্ত সিলিকনের ধারাগুলি চওড়ায় বাড়ছিল ততই। ফাটলটার কাছাকাছি আসতেই এরেম টের পেল—দেয়ালের ফাঁক দিয়ে গলন্ত তরল ছলকে ছলকে বেরিয়ে আসছে। হঠাৎ কিছু বোঝার আগেই এক ঝলক উত্তপ্ত সিলিকন এসে পড়ল দেয়ালের গায়ে ভর দিয়ে রাখা ওর একটা হাতে! এরেম টের পেল, ওই প্রচণ্ড তাপে দুমড়ে মুচড়ে হাতটা ওর শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিচের মেঝেয় গিয়ে পড়ল। ওর ভারী শরীরটাও টাল সামলাতে না পেরে পড়েই যাচ্ছিল; শেষমুহূর্তে এরেম কোমর থেকে একটা বাড়তি যন্ত্রাংশ দেয়ালের দিকে বাড়িয়ে ধরে নিজের পড়ে যাওয়াটা আটকালো।

'কাজ কেমন চলছে?' হেডফোনে স্প্যাস্কির গলা শোনা যায়। 'এত চুপচাপ কেন?'

'আমি ফাটলটার কাছে আসতে পেরেছি।' ক্ষীণকণ্ঠে জবাব দেয় এরেম।

উত্তোলক-যন্ত্রটা ওকে দেয়ালের আরও কাছে নিয়ে যেতে অক্ষম। যন্ত্রের সঙ্গে পায়ের সংযোগটা ছিন্ন করতেই অবশ্য দেয়ালের দিকে আর একটু এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হল। ফাটলটা ওর কাছ থেকে এখন মাত্র দু-মিটার দূরে। হ্যাঁ, এখান থেকে মেরামতির কাজটা চালানো যায়।—মনে মনে ভাবল এরেম।

তাপমাত্রা ইতিমধ্যে পনেরোশো ডিগ্রি ছাড়িয়েছে! সামনের দেয়ালটা কেমন যেন অস্পষ্ট ঠেকছে।

ফাটল দিয়ে বেরিয়ে আসা ফুটন্ত তরলের আঁচে চোখমুখ ঝলসে যাচ্ছে! এতে একাগ্রতা নষ্ট হয়। ওর ইলেকট্রনিক মগজ যাতে ঠিকমতো কাজ করে তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালাল এরেম।

গরমটা যেন ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠছে। এরেম টের পেল—ওর বুদ্ধিকে চালনা করে যে স্ফটিকখণ্ড, তাও নষ্ট হতে চলেছে। অথচ ওটা পুরোপুরি অকেজো হবার আগেই মেরামতের কাজটা সারতে হবে। অ্যাস্‌বেস্‌টসের জ্যাকেট ফুঁড়ে প্রচণ্ড তাপ শরীরে এসে পৌঁছচ্ছিল; চারটে চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে, তা সত্ত্বেও মনস্থির করে ফাটলটা সারাই-এর জন্য যা করণীয় তা ঠিক করে যাচ্ছিল এরেম। একবার মনে হল, ওই প্রচণ্ড তাপে আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই বুঝি গোটা শরীরের কলকবজাগুলো সব অকেজো হয়ে যাবে! আহ্,

BanglaBook.org

এই সময়ে যদি কয়েক সেকেন্ডের জন্যেও ঠান্ডা হওয়া যেত! শরীরটাকে জুড়িয়ে নেওয়ার উপায় যে নেই তাও নয়। চারপাশের পাখাগুলো চালিয়ে দিলেই হয় কিন্তু তাতে সিলিকন জমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। খানিকটা দ্বিধার সঙ্গেই ফোনের মধ্যে দিয়ে স্প্যাস্‌কিকে জিজ্ঞাসা করল এরেম, 'মাত্র কুড়ি সেকেন্ডের জন্য কি পাখাগুলো চালাতে পারি?'

'না', স্প্যাস্‌কির উত্তর তৈরি ছিল, 'কোনো অবস্থাতেই নয়। সিলিকন সব নষ্ট হয়ে যাবে! আচ্ছা, তুমি এতক্ষণ ধরে কী করছ ওখানে বলো তো?'

'মেরামতের কাজটা শুরু করছি।'

এরেম জানত, স্প্যাস্‌কি পাখা চালানোর অনুমতি দেবে না। অথচ ব্যাপারটা ওর কাছে প্রায় মৃত্যুদণ্ডের সামিল! তা হোক, ও তো নেহাতই একটা যন্ত্র। দশলক্ষ টন সিলিকনের দাম নিশ্চয়ই ওর তুলনায় অনেক অনেক বেশি। শান্ত মনে কাজ শুরু করে এরেম।

শরীরের মধ্যে পোড়ার যে যন্ত্রণা হচ্ছিল তাকে আর গুরুত্ব না দিয়ে এরেম ওর কোমরের সঙ্গে বাঁধা যন্ত্রপাতির বাক্স থেকে একটা লম্বাটে সাঁড়াশি ধরনের জিনিস বের করল। যন্ত্রের ডগায় বেশ খানিকটা তাপ-নিরোধক তুলো গুঁজে নিয়ে ফাটলটার দিকে এগিয়ে ধরল এরেম। তরলের স্রোত অবশ্য তাতে বন্ধ হল না—উল্টে সাঁড়াশিটাই বেঁকে দুমড়ে পড়ে গেল নিচে।

একটা হাত অকেজো, বাকি হাতটা দিয়েই কাজ সারতে হচ্ছিল ওকে। ওই হাত দিয়েই আগেরটার মতো আর একটা যন্ত্র বের করল এরেম। আবার আগের মতোই তাতে খানিকটা তাপ-নিরোধক তুলো নিয়ে ফাটলটার মুখে চেপে ধরার চেষ্টা করল। সঙ্গে সঙ্গে ঠিক আগের মতোই যন্ত্রটার টাংস্টেনের তৈরি হাতল দুমড়ে-মুচড়ে ভেঙে পড়ল নিচে!

কেমন যেন সব গোলমাল ঠেকছে। এরেমের মনে হল—বুদ্ধি যেন আর কাজ করছে না। জন্মের পর প্রথম দিনের স্মৃতি হঠাৎ ভেসে উঠল মনের মধ্যে। মন থেকে সব স্মৃতি ঝেড়ে ফেলে কাজে মনোযোগ দেওয়ার বৃথাই চেষ্টা করল এরেম। পুরনো দিনের সব ঘটনা—যে কারখানায় ওকে তৈরি করা হয়েছিল সেখানকার লোকজনের মুখ, জীবনের সেই প্রথম আলো দেখার আনন্দ—এরেমের মনে বারবার ভেসে উঠছিল। কারখানার মেশিনের আওয়াজ, লোকজনের কথাবার্তা—সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠছিল একজনের উৎফুল্ল কণ্ঠস্বরঃ 'আমাদের নতুন বুদ্ধিমান রোবট, তোমার অস্তিত্বকে স্বাগত জানাই।'....কিছুক্ষণের স্তব্ধতা, তারপরই এরেমের খেয়াল হল—সাঁড়াশি ধরনের যন্ত্র আর একটাই অবশিষ্ট আছে ওর কাছে; তা দিয়েই শেষ চেষ্টা চালাতে হবে।

আবার বেশ খানিকটা তুলো নিয়ে ফাটলের মুখে ঠেসে ধরল ও। এবার আর লক্ষ্যে ভুল হয়নি। তাপ-নিরোধক তুলো গলন্ত সিলিকনের স্রোতকে আটকাতে পেরেছে। যন্ত্রটাকে টেনে নিয়ে তার ডগায় আবার নতুন করে তুলো আটকে নেয় এরেম।......তৃতীয়বারে নেওয়া তুলোর স্তূপটা ফাটলের মুখ পুরোপুরি বুজিয়ে দিল। ব্যস্, কাজ শেষ; এবারে নেমে আসতে হবে।

কেউ যেন টেলিফোনে কিছু বলছে—স্প্যাস্কি হবে বোধহয়; এরেম অতি কষ্টে কথা বলার চেষ্টা করে, 'মেরামত হয়ে গেছে। কাজটা শেষ।'

এলোমেলো চিন্তা আবার ওকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। ওদের মতো বুদ্ধিসম্পন্ন রোবটদের যেখানে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, সেই জায়গার ছবিটা এরেমের মনের মধ্যে ফুটে উঠছিল। ওদের শিক্ষক কালিস্তভের চিৎকার বাজছিল কানের মধ্যেঃ 'উঠে দাঁড়াও! ওই বাঁদিকের দেয়ালটা ধরে এগিয়ে যাও, ঘরের ছাদটাকে ধরার চেষ্টা করো....।' প্রশিক্ষণ-কেন্দ্রে থাকাকালীন শেষ দায়িত্বটার কথা মনে পড়ছিল ওর। সেই সমুদ্রের ধারে পাথরের স্তূপ জড়ো করে বাঁধ দেওয়ার চেষ্টা.........। অতীতদিনের টুকরো টুকরো স্মৃতিগুলো মনের মধ্যে ভাসছিল ওর।

এরেম খেয়াল করেনি, কখন যে ওর শরীরের নিচের অংশটা খসে পড়ে গেছে! সব জ্বালা-যন্ত্রণার অবসান! শরীরের কেন্দ্রীয় মোটরটাও ঘড়ঘড় শব্দ তুলে বন্ধ হয়ে গেল! ভাঙা রেকর্ডের মতো একটা আওয়াজ ভেতরের কোনো যন্ত্র থেকে থেকে বারে বারে বেরিয়ে আসছিল—'কাজটা হয়েছে...কাজটা হয়েছে...কাজটা হয়েছে...'

স্প্যাস্কি সিগারেটে শেষ টানটা দিয়ে ফিল্টারের অংশটাকে অ্যাশ্‌ট্রেতে গুঁজে দিল। তারপর টেলিফোন-রিসিভারটা কাছে টেনে নিয়ে রোবট-বিশেষজ্ঞের নম্বরটা ঘোরাতে শুরু করল।

'সব ঠিক হয়ে গেছে। ক্রিস্টালাইজার এখন ঠিকমতো কাজ করছে।'

'এরেমের খবর কী?' বিশেষজ্ঞ-ভদ্রলোক জানতে চান।

'কাজটা হয়েছে, কাজটা হয়েছে—এ শব্দটাই শুধু বারবার শুনতে পাচ্ছি।'

'খুব দুঃখের কথা।' টেলিফোনের অন্য প্রান্ত থেকে দীর্ঘশ্বাসের শব্দ ভেসে আসে। 'সত্যিই দুঃখের, বুঝতে পারছি না, এরেমকে আবার ঠিক করে নেওয়া যাবে কিনা। যাই হোক, আপনার ওই মেশিনঘর থেকে গলন্ত সিলিকন বের করে নেওয়ার পর একবার জানাবেন। আমি গিয়ে ওর অবস্থাটা একবার দেখব।'

'আচ্ছা, জানাব।' বলেই খট্ করে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল স্প্যাসকি।

BanglaBook.org

সবুজ মানুষ

ক্লিফোর্ড সিম্যাক

অফিস থেকে বাড়ি ফিরে যেই আমি জানলার দিকে মুখ করে বসি, অমনি চোখে পড়ে পাড়ার সেই নচ্ছার কুকুরটার কাণ্ডকারখানা। জানলার সামনে রাখা ডাস্টবিনের ময়লা আবর্জনাগুলোকে চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কুকুরটা যে কী আনন্দ পায়? ডাস্টবিনের ঢাকনির ওপর কতদিন যে থান ইঁট চাপা দিয়েছি, কতদিন পাথর ছুঁড়ে মেরেছি কুকুরটাকে! জঞ্জাল ঘাঁটার নেশা তবু ওর ছোটেনি।

সেদিনটার কথা মনে পড়ে। সক্কালবেলায় টেলিফোনে বুড়ো পিট-এর গলা পেলাম।

'একবার আমার এখানে আসতে পারো?'

'আসছি, কিন্তু ব্যাপারটা কী?'

'আমার বাগানের উত্তর দিকের অনেকটা জায়গা থেকে কারা যেন মাটি খুবলে নিয়ে গেছে! আর প্রকাণ্ড সেই গর্তের চারপাশে পড়ে আছে বেশ খানিকটা ঝুরঝুরে বালি!'

পিট-এর কথায় ধাঁধা লাগে। ওর বাগানে লোকে গর্ত খুঁড়তে যাবে কেন? তাছাড়া ওর জমির কাদামাটির পাশে বালির ঢিপিই বা আসে কোত্থেকে?

ফোন নামিয়ে পিট-এর বাড়ির দিকে রওনা দিই। আমাদের এই ছোট মফস্বল শহরের বাসিন্দারা প্রায় সবাই সবাইকে চেনে। পিট-এর মতন অনেকেই আবার আমার ওপর একটু বাড়তি ভরসা করে থাকে। আমি নাকি নানাজনের নানা সমস্যার সমাধান করতে পারি!

বাগানেই দাঁড়িয়েছিল পিট। সঙ্গে আরও জনাকয়েক পাড়াপড়শি। মাটির ওপর হাঁ করে থাকা এক বিশাল গর্তের সামনে দাঁড়িয়ে ওরা ভীষণ উত্তেজিতভাবে কী যেন বলাবলি করছিল।

গোলাকার গর্তটার দিকে ভালো করে তাকালাম। ব্যাস হবে আন্দাজ তিরিশ ফুট। গভীরতাও পঁয়ত্রিশ ফুটের কম নয়। এমন সুন্দরভাবে চারপাশের মাটি কাটা হয়েছে যে গর্তটা একেবারে নিখুঁত শঙ্কুর আকার নিয়েছে। কোদাল-বেলচা দিয়ে এমন মসৃণভাবে মাটি কাটা যায় না; নির্ঘাত কোনো মেশিনের কাজ। গর্ত

BanglaBook.org

থেকে একটু দূরেই সাদা বালির স্তূপ। কেন জানি না মনে হল, ওই বালি দিয়ে গর্তটাকে কানায় কানায় ভর্তি করে ফেলা যায়। আশপাশে অনেক দূর পর্যন্ত দৃষ্টি চালিয়েও কোথাও কোনো গাড়ি অথবা ট্রাকের চাকার দাগ চোখে পড়ল না।

হঠাৎ মনে হল, এখানকার মাটি অবশ্যই পরীক্ষা করা দরকার। এটা মনে হতেই পিট-এর বাড়ি থেকে দু-খানা কৌটো জোগাড় করে তার একটাতে ওই গর্তের মাটি আর অন্যটাতে বালির ঢিপি থেকে খানিকটা বালি চটপট পুরে ফেললাম।

বাড়ি ফিরে শুনলাম, ব্যাঙ্ক-মালিক স্টিভেন্স্ নাকি ফোন করেছিলেন। সময়-সুযোগ করে আমায় একবার ওঁর বাড়ি যেতে বলেছেন। ভদ্রলোকের একটা বিরাট বাগান আছে জানতাম। শুনেছিলাম, সেই বাগানে নানা জাতের দেশী-বিদেশী ফুল ফোটানোই ওঁর একমাত্র নেশা। নিশ্চয়ই ওই বাগানের ব্যাপারেই আমার সাহায্য চাই। ব্যাঙ্ক-ট্যাঙ্ক কিংবা টাকা-পয়সার ব্যাপারটা যে আমি তেমন বুঝি না, সেটা উনি জানেন।

আমার ধারণা যে নির্ভুল তার প্রমাণ পেলাম খানিক পরেই। মাটি পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট এক ল্যাবরেটরিতে পিট-এর বাগানের মাটি আর বালির নমুনা পৌঁছে দিয়ে স্টিভেন্স্-এর সঙ্গে দেখা করতেই ভদ্রলোক একেবারে হাউহাউ করে কেঁদে উঠলেন। বললেন, ‘আমার বাড়ির পেছনের বাগানে একবার চলুন। কতদিনের চেষ্টায় যে নানা জাতের সব দুষ্প্রাপ্য ফুলের বীজ জোগাড় করে তা থেকে গাছ বানিয়েছি! কে আমার এমন সর্বনাশ করল?’

তারপরেই স্টিভেন্স্-এর সঙ্গে ওঁর সাধের বাগানে গেছি এবং সেখানকার দৃশ্য আমার কাছেও যথেষ্ট মর্মান্তিক ঠেকেছে। অতবড় বাহারি বাগানটায় একটাও জ্যান্ত গাছ চোখে পড়েনি। কে যেন ভীষণ আক্রোশে বাগানটাকে একেবারে মুড়িয়ে রেখে গেছে!

স্টিভেন্স্-এর কোনো শত্রু বিষাক্ত ওষুধ-টষুধ ছিটিয়ে গাছগুলো নষ্ট করে দিয়েছে কি না ভাবতে ভাবতে জমির ওপর এদিক ওদিক ছড়িয়ে থাকা ফুলগুলোর দিকে নজর দিতেই গর্তগুলো চোখে পড়ল। অগুন্তি ছোট ছোট গর্ত ছড়িয়ে রয়েছে সারা বাগান জুড়ে! সাধারণত জমি থেকে আগাছা টেনে তোলার পর যে ধরনের গর্ত থেকে যায় ঠিক তেমনই দেখতে লাগছিল ওগুলোকে।

‘এর মধ্যে কি বাগান থেকে আগাছা তুলেছেন?’ স্টিভেন্স্-কে জিজ্ঞাসা করি।

‘তা তো তুলেছি। সব সময়েই তুলি,’ স্টিভেন্স্ উত্তর দেন, ‘ফুলগাছগুলোকে

বাঁচিয়ে রাখতে হলে আগাছা তো তুলতেই হয়। তবে কথা হল কী জানেন, বাগানের সাধারণ আগাছা উপড়ে নিলে জমিতে যেটুকু গর্ত হয়—এই গর্তগুলো তার তুলনায় অনেক বড়। গোলমালটা তো এখানেই।'

বলাবাহুল্য, প্রায় আধঘণ্টাটাক অপেক্ষা করার পরও রহস্যভেদের কোনো সূত্র খুঁজে না পেয়ে আগের বারের মতোই স্টিভেন্‌স্‌-এর বাড়ি থেকেও একটা টিনের কৌটো জোগাড় করেছি এবং যথারীতি তার মধ্যে গর্তের মাটির নমুনা পুরে রওনা দিয়েছি বাড়ির দিকে।

বাড়ির কাছাকাছি আসতেই টের পেলাম, রাস্তার কুকুরগুলো বড় একটা ঝোপের কাছে জড়ো হয়ে তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। নির্ঘাত ওই ঝোপের মধ্যে বেড়াল-টেড়াল ঢুকেছে—ভাবতে ভাবতে এগিয়ে যাই। কুকুরগুলো বোধহয় আমায় দেখেই এক এক করে সরে পড়ল। ঝোপের মধ্যে কী আছে দেখতে গিয়েই চোখে পড়ল সেই অদ্ভুত জিনিসটা।

সেটাকে আগাছা বলাই ভালো; যদিও প্রায় ফুট পাঁচেকের মতন উঁচু। সত্যি বললে, আমার চেনা তো নয়ই—এমন অদ্ভুত শেকড়ওয়ালা কোনো আগাছা যে পৃথিবীতে জন্মায়, ধারণা ছিল না। আগাছার গোড়ার দিকটা মানুষের কবজির মতো মোটা; ওর মাঝামাঝি থেকে গোটা চারেক শাখা বেরিয়েছে আর একদম আগায় ফুটে আছে অদ্ভুত ধরনের কয়েকটা ফুল! তেমন ফুল আমি জন্মে দেখিনি।

দিনের আলোয় ভালো করে দেখব বলে ওটাকে সঙ্গে নিয়ে এলাম বাড়িতে—রেখে দিলাম লনের একপাশে। বাড়িতে একা থাকি, রান্নাবান্না নিজেকেই করতে হয়। খাওয়া-দাওয়া সেরে বিছানায় শুয়ে মনে হল, আগাছাটাকে লনের মধ্যে ফেলে না রেখে ঘরে নিয়ে আসি। বারান্দার আলো জ্বেলে ঘরের বাইরে বেরতেই চমকে উঠলাম। ওটাকে যেখানে রেখেছিলাম সেখান থেকে সরে গেছে লনের অন্য কোণে এবং ডালপালা দিয়ে আঁকড়ে ধরেছে লনের পাঁচিলটাকে! মানুষের মতোই ঠিক সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে ওটা—যেন এক্ষুনি পাঁচিল ডিঙোবে! সেই মুহূর্তে সত্যিই আমি ভয় পেয়েছিলাম এবং সেই কারণেই বোধহয় বারান্দার একপাশে রাখা কুড়ুলটাকে তুলে নিয়েছিলাম হাতে। হয়তো ভেবেছিলাম, আগাছাটা যদি পাঁচিল ডিঙিয়ে বাইরে যেতে চায় তবে কুড়ুল দিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলব। কয়েক মিনিট রুদ্ধশ্বাসে কাটল, তারপর দেখি ওটা আস্তে আস্তে পিছু হটছে। কী যে মনের মধ্যে হয়ে গেল আমার! কুড়ুলটা ঠক করে মেঝের ওপর ফেলে দিয়ে বাগানে জল দেওয়ার বালতিতে জল ভরে তার মধ্যে ডুবিয়ে দিলাম আগাছার মূলগুলো। ঘরে এসে মনে হল—জল ছাড়া অন্য কোনো খাবার

BanglaBook.org

তো দেওয়া হল না। সঙ্গে সঙ্গে ফের বাগানে গিয়ে খানিকটা মাটি তুলে এনে বালতির মধ্যে ফেলে দিলাম। রাত্রে তো সূর্যের আলো পাওয়ার উপায় নেই, তাই বারান্দার জোরালো আলোর নিচে টেনে আনলাম আগাছা-সুদ্ধ বালতিটাকে।

গাছের বেঁচে থাকার জন্য যা যা দরকার তার সবই ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঘরে ফিরে দরজা বন্ধ করে বিছানায় শুতে গিয়ে যেই আগাছাটার কথা ভেবেছি, অমনি যেন আমার শরীরের মধ্যে দিয়ে শিহরন বয়ে গেল। মনে হল, ওটা অপার্থিব জীব নয়তো? পৃথিবীর যেসব গাছপালা আমরা চিনি, তারা কি কখনও মাটির ওপর চলে ফিরে বেড়াতে পারে? কাউকে বললে হয়তো হেসে উড়িয়ে দেবে—আমার কিন্তু নিশ্চিতভাবে মনে হল, ওটা নিশ্চয়ই অন্য কোনো গ্রহ থেকে আসা বুদ্ধিমান প্রাণী।

কিন্তু পৃথিবীতে ওটা এল কীভাবে? আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল পিট-এর বাগানের সেই প্রকাণ্ড খাদ আর স্টিভেন্‌স্-এর বাগানের অগুন্তি গর্তগুলো। ওগুলোর সঙ্গে কী এই আগাছার কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে? ব্যাপারটা জানতে হবে এবং এক্ষুনি। স্টিভেন্‌স্-এর বাড়ি আমার বাড়ি থেকে বেশি দূরে নয়। আমার জোরালো ফ্লাশ-লাইটটা নিয়ে দৌড়লাম; ওঁর বাগানে গিয়ে গর্তগুলোকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। লক্ষ করলাম, ওখানে রয়েছে ঠিক আট সারি গর্ত; প্রত্যেক সারিতে আবার গর্তের সংখ্যা চার। বুঝতে কষ্ট হল না, আমার বাড়ির অতিথিটিকে এইরকম এক সারিতে রেখে দিলে এবং সে তার শরীরের চারটে প্রশাখা দিয়ে মাটি আঁকড়ে ধরলে ঠিক এইরকমই চার-চারটে গর্ত হত।

আগাছাটা তাহলে একা আসেনি। অন্তত আরও জনাসাতেক সঙ্গী নিয়ে এই বাগানে ঢুকেছিল। স্টিভেন্‌স্ হঠাৎ মাঝরাত্তিরে ঘুম ভেঙে উঠে আমাকে ওঁর বাগানে দেখলে অবাক হবেন নিশ্চয়ই, তবুও আমি ফ্লাশ-লাইটের জোরালো আলোয় গোটা বাগানে তন্ন তন্ন করে খোঁজ করলাম ওদের; অবশ্য একটারও দেখা মিলল না।

কোথায় গেল ওরা?

বাড়ি এসে যেখানে আগাছাটাকে রেখেছিলাম, সেখানে গেলাম। যে বালতিতে মাটি আর জল রেখেছিলাম তা ঠিক তেমনই পড়ে আছে—গাছটাই শুধু উধাও! বারান্দা, উঠোন আর বাগানটায় আলো জ্বেলে খুঁজলাম, শেষে বাড়ির সদরের দিকটায় এসে দেখি—জানলার ওপর উঠেছে ওটা। জানলার গায়ে আমার বাহারি ফুলগাছগুলোর কী করুণ দশা! আমি স্তম্ভিত। গাছটা না হয় চলতে ফিরতে

BanglaBook.org

পারে, কিন্তু তাই বলে উঠোনের দিকের দরজার তালা খুলে সদরের দিকে আসে কী করে? ঋজু, সতেজ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিল গাছটা—কী দারুণ চনমনে আর প্রাণবন্ত দেখাচ্ছিল ওকে! জানলার সামনে দাঁড়াতেই গাছটা একটু নুয়ে পড়ে একটা শাখা বাড়িয়ে দিল আমার দিকে; তারপর ঠিক যেমনভাবে বন্ধুর পিঠে হাত দিয়ে আমরা আলতো করে চাপড় মারি, ঠিক তেমনি গাছের ডালটাও বারকয়েক স্পর্শ করল আমার শরীর। হঠাৎ মনে হল—ভিনগ্রহের এই বুদ্ধিমান প্রাণীটি মোটেই ভয়ঙ্কর কিছু নয়, বরং আপাতত আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতেই আগ্রহী। আমার বাগানে ওকে অনায়াসে আশ্রয় দেওয়া যায়। আর যদি তেমন কোনো বেগড়বাই করে, তবে আর্সেনিক আর অন্য সব কীটনাশক তো রয়েছেই। আমি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোতে চললাম।

পরের দিন সারাক্ষণই ব্যস্ততায় কেটেছে—সন্ধেবেলা গাছটার কথা হঠাৎ মনে পড়ল। বাগানে যেখানে লেটুস গাছগুলো রয়েছে সেখানেই দেখতে পেলাম গাছটাকে। আশপাশের লেটুস গাছগুলো মরে পড়ে রয়েছে। ওটা কি তাহলে অজ্ঞাত কোনো বিষ ছড়িয়ে আশপাশের গাছগুলিকে মেরে ফেলছে যাতে ওর জমিতে কেউ ভাগ না বসায়? এরকম একটা সম্ভাবনার কথা মনে আসছিল। গাছটা বোধহয় আমায় চিনতে পারল। স্পষ্ট দেখলাম—ওর ডালগুলো নড়ে উঠল, যদিও একটুও হাওয়া ছিল না তখন।

রাতের খাওয়ার পর বাইরে বেরিয়ে দেখি, প্রতিবেশীর বাগানের পাঁচিলের গায়ে গোটা কয়েক আগাছা মরে পড়ে আছে। আমার প্রতিবেশীটি যে তাঁর বাগানে প্রচুর রাসায়নিক সার দিয়ে থাকেন তা আমি জানতাম। নিশ্চয়ই রাসায়নিক বিষেই গাছগুলোর মৃত্যু ঘটেছে। তবে কি ভিনগ্রহ থেকে বুদ্ধিমান প্রাণীদের মধ্যে মাত্র একটাই বেঁচে আছে এবং সেটা আপাতত রয়েছে আমার বাগানেই?

নিজের বাড়ির দিকে ফিরে আসার সময় দেখি—ডাস্টবিনের ধারে দাঁড়িয়ে একটা কুকুর বিরক্তিকরভাবে আবর্জনা ঘাঁটছে; বহুদিন ওই কুকুরটাকে ইট ছুঁড়ে মেরেছি, কিন্তু লাভ হয়নি। ওটা প্রতিরাত্রে ফিরে ফিরে আসবেই।

ঘরে ফিরে শুয়ে পড়েছিলাম। কতক্ষণ পর খেয়াল নেই, আচমকা ঘুম ভেঙে গেল কুকুরের আর্ত চিৎকারে। জানলা খুলে দেখি—কুকুরটা প্রাণপণে ছুটছে, আর পেছন পেছন তাড়া করে চলেছে আমার ভিনগ্রহী অতিথি! একটা ডাল দিয়ে সে আঁকড়ে ধরেছে কুকুরটার লেজ।

কুকুরটা যে আবর্জনা ছড়িয়ে রোজ আমাকে বিরক্ত করে, তা কি আমার অতিথি বুঝতে পেরেছে? আর তাই কি ওকে আশ্রয় দেওয়ার প্রতিদানে ও

BanglaBook.org

কুকুরটার উপদ্রব বন্ধ করে আমার উপকার করতে চাইছে? হঠাৎ মনে হল, আমি এবং গাছটা বোধহয় পরস্পরকে খানিকটা বুঝতে পেরেছি।

পরের দিন সকালেই আমার প্রতিবেশী এসে হাজির। আমাকে দেখেই হেসে বললেন, 'জানেন, জেনি বলছিল, আপনার বাগানে নাকি একটা গাছকে ও চলে ফিরে বেড়াতে দেখেছে। কী মজার মজার কথাই না বলতে পারে বাচ্চারা!'

বুঝলাম, নেহাত বাচ্চা বলেই জেনি-র কথাকে কেউ গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু আমাকে তো এবারে সাবধান হতে হয়। প্রতিবেশী ভদ্রলোক চলে যেতেই বাগানে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমাকে দেখতে পেয়ে গাছটা তার শেকড়গুলোয় ভর দিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। আগের মতোই ডালপালাগুলো আলতো করে বুলিয়ে দিল আমার গায়ে। দুজনে আমরা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। এখানে আশ্রয় পেয়ে গাছটা যে আমার প্রতি কতটা কৃতজ্ঞ সে ব্যাপারে আর সংশয় রইল না।

ফিরে যাচ্ছিল গাছটা, আমি ডাকলাম, 'অ্যাই, শোনো।'

মানুষ যেমন পিছু ডাক শুনে ফিরে আসে, ঠিক তেমনি গাছটাও আস্তে আস্তে ফিরে এল আমার কাছে। ভিনগ্রহের প্রাণীটি কি তাহলে মানুষের ভাষা বোঝে?

দূরে রাস্তার ওপাশে কয়েকটা বাচ্চা ছেলে দাঁড়িয়েছিল; আঙুল তুলে তাদের দেখালাম। মুখে বললাম, আকারে-ইঙ্গিতেও বোঝালাম—আমাদের পৃথিবীর গাছপালা কেমন মাটি আঁকড়ে স্থির হয়ে থাকে, সেই কারণে, বাগানে ওর চলাফেরায় বাচ্চাদের মনে কৌতূহল জাগবে, ও ধরা পড়ে যাবে। গাছটা যেন বুঝল আমার কথা। আস্তে আস্তে আমার হাতটা জড়িয়ে ধরে টেনে নিয়ে চলল বাগানের পরিত্যক্ত গ্রিন হাউসটার দিকে। অর্কিড রাখব বলে একসময় বানিয়েছিলাম ওটা। অর্কিড-টর্কিড রাখা হয়নি, ঘরটা খালিই পড়ে আছে। গ্রিন হাউসে ঢুকে স্থির হয়ে দাঁড়াল গাছটা। আমি বললাম, 'এই ভালো। দিনের বেলায় তুমি বরং এখানেই থেকো। রাতে বাগানে ঘুরে বেড়ালেও কেউ টের পাবে না। অবশ্য পূর্ণিমার রাতে সাবধান!'

গাছটা বুঝল আমার কথা। সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়ল।

বস্তুত ওকে নিয়ে আর কোনো সমস্যাই রইল না এরপর। আমি অবশ্য প্রায়ই ভাবতাম, ভিনগ্রহের এই প্রাণীটি তার সঙ্গীদের নিয়ে পৃথিবীতে এল কেন? আমার বিশ্বাস, পিট-এর বাগানে প্রথম দিন যে বিশাল গহ্বর দেখেছিলাম সেখানেই এসে নেমেছিল ভিনগ্রহের মহাকাশযান। কিন্তু ফিরে যাওয়ার সময় কেন সেটা ফেলে গেল তার আরোহীদের? না কি আমার অতিথির মতো

BanglaBook.org

কয়েকজন চুপি চুপি নেমে পড়েছিল মহাকাশযান থেকে? কিন্তু কেন? কীসের আশায় ওরা থেকে গেছে সম্পূর্ণ অপরিচিত, বিপজ্জনক এক গ্রহে?

দিনকয়েক কাটল গাছটাকে নিয়ে। অবসর সময়ে আমরা পাশাপাশি বসি, আমাদের এখানকার পশুপাখি, গাছপালা আর মানুষের কথা ওকে বলি। একদিন একটা ইলেকট্রিক মোটরের কলকব্জা খুলে আবার তা এক এক করে জুড়লাম ওর সামনে বসে। ওকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম—কীভাবে বিদ্যুৎশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করি আমরা। ইলেকট্রিসিটির ব্যাপারটা অবশ্য আমি নিজেই ভালো জানি না—এবং গাছটাও আমার কথা শুনে বৈদ্যুতিক মোটর সম্পর্কে বিশেষ কিছু বুঝেছে, এমনটা আমার কল্পনায় ছিল না। আমার বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর গাছটা আমায় অবাক করে দিয়ে মোটরের কলকব্জাগুলো ঝটপট খুলে ফেলল, আর পরক্ষণেই নিপুণভাবে জুড়ে দিল! সুইচ দিয়ে দেখলাম, দিব্যি চলছে মোটরটা।

এরপর আমার অতিথিকে একটা অপেক্ষাকৃত সোজা কাজ শেখানোর কথা ভাবলাম। বাগানে কাঠের তক্তা পড়েছিল সেগুলি দেখেই হঠাৎ আমার মাথায় আইডিয়া এলো ওই তক্তাগুলো দিয়ে তো পাখির খাঁচা বানানো যায়। খাঁচার মাপে তক্তাগুলোকে করাত দিয়ে কাটতে বললাম। গাছটা শান্ত হয়ে আমার কাজ দেখছিল; কেন জানি না, আমার মনে হল—ওর বসে থাকার ভঙ্গিটা ভারি বিষণ্ণ। ওর মধ্যে এরকম বিষণ্ণতা দেখেছিলাম আরেকদিন। সেদিন ওর সামনে আমি ফুল তুলছিলাম বাগান থেকে। ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে গিয়ে মনে হল—আমার অতিথি ভিনগ্রহের বাসিন্দা হলেও এখানকার গাছপালা তো ওরই স্বজাতি। সেই গাছ থেকে তক্তা বানাতে কিংবা ফুল ছিঁড়তে দেখলে ওর তো কষ্ট হবেই। ও তো দেখছে—এখানকার মানুষরা গাছপালা কেটে নষ্ট করছে; খাবার দাবার, পোশাক-আশাক সবই আসছে গাছপালা থেকে। আমাদেরই কী ভালো লাগবে যদি কোনো গ্রহে গিয়ে দেখি—সেখানকার অধিবাসীরা মানুষের মতো আকৃতির প্রাণীদের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করছে?

একেকবার মনে হত, আমার অতিথিকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-বিজ্ঞানীদের কাছে যাই। কিন্তু আমি তো মফস্বলের মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ—বিজ্ঞানীদের কাকেই বা চিনি! কার কাছে নিয়ে যাব তা ভেবে ঠিক করতে পারিনি বলে ওকে নিয়ে যাওয়াও হয়নি কোথাও।..........

মাঝে মাঝে আমরা বাগানে চুপচাপ বসে থাকতাম। একদিন দেখি ওর সামনে একটা লতানে গাছ নেতিয়ে পড়ে আছে। আমার অতিথির উপস্থিতির জন্যই কিনা কে জানে, মনটা আমার ভীষণ খারাপ লাগছিল; গাছটা মরে যাচ্ছে দেখে

BanglaBook.org

কষ্ট হচ্ছিল খুব। একসময় হঠাৎ দেখি—মৃতপ্রায় লতানে গাছটা আপনা থেকেই আস্তে আস্তে কেমন সতেজ সজীব হয়ে উঠছে!

ব্যাপারটা নিয়ে তারপর আমি দিনরাত ভেবেছি। মৃতপ্রায় গাছটার জন্য যেই আমার মনে সত্যিকারের বেদনাবোধ জেগে উঠল, অমনি শুধুমাত্র আমার সহানুভূতির ছোঁয়ায় গাছটা বেঁচে উঠল—এটা কি আদৌ বিশ্বাসযোগ্য? মনে হল, ব্যাপারটা আবার পরীক্ষা করে দেখা উচিত। আমার উঠোনের পাশেই রয়েছে একটা হলুদ রঙের গোলাপ গাছ। এমন রুগ্ন গাছ পৃথিবীতে আর দুটি আছে কিনা সন্দেহ। ক'বচ্ছর ধরে গাছটার পরিচর্যা কিছু কম করা হয়নি। কিন্তু হলে কী হবে, গাছটার যেন বেঁচে থাকার উৎসাহ নেই! কখনও ভালো করে ফুল পর্যন্ত ফোটেনি। হতশ্রী গাছটার সামনে দাঁড়িয়ে থাকাটাই এক বিড়ম্বনা, তা সত্ত্বেও মনে মনে ওর প্রতি দয়ালু হতে চাইলাম; ওটা আর পাঁচটা গাছের মতো সতেজ হয়ে উঠুক সেটাই কামনা করলাম। দিন সাতেক পরপর গাছটার সামনে দাঁড়িয়ে ওর সমৃদ্ধি কামনা করতে করতে একসময় দেখি—কখন যেন ওর ফুল-পাতা এমনকী কাঁটাওয়ালা ডালগুলোকেও মনেপ্রাণে ভালোবেসে ফেলেছি। এরও কয়েকদিন পর অনুভব করলাম—ধীরে ধীরে হলেও গোলাপ গাছটার মধ্যে একটা পরিবর্তন আসছে। ক্রমে গাছের পাতাগুলো সব ঝরে গিয়ে নতুন পাতা গজাল; তেমন ঝকমকে সবুজ পাতা আর হয় না! তারপর সেই গাছে কুঁড়ি এল, ফুল ফুটল চারদিক আলো করে...

আমার অতিথির সঙ্গে বন্ধুত্ব ক্রমেই বাড়ছিল। যখন দুজনে মুখোমুখি বসতাম, ওকে আমার আর গাছ বলে মনে হত না। ভাবতাম, ও বুঝি পৃথিবীর আরেক জায়গার মানুষ—যার আবেগ-অনুভূতি আমার মতোই; শুধু পরস্পরের ভাষাতে আমরা কথা বলতে পারি না।

শরতের মাসগুলো কেটে যাওয়ার পর যখন হিমেল বাতাস বইতে শুরু করল, অমনি খেয়াল হল—শীত আসছে। অতিরিক্ত শীতে পাছে আমার বন্ধু কাবু হয়ে পড়ে, সেই চিন্তাই আমায় ঘিরে ধরেছিল। এইরকমই এক রাতে আমরা দুজনে যখন বাড়ির পেছনের উঠোনে বসে ঝিঁঝি পোকার ডাক শুনছি—হাল্কা মহাকাশযানটা নজরে এল আমার। বাগানের গাছগুলোর মাথায় কখন যে নিঃশব্দে নেমে এসেছিল, টেরই পাইনি! আস্তে আস্তে যানটা এসে বাগানের খোলা ঘাসজমিতে দাঁড়াল। কেন জানি না—আমি তেমন অবাক হইনি। হয়তো মনে মনে আশা ছিল—ওর সঙ্গীরা নিশ্চয়ই একদিন ওর খোঁজে আবার ফিরে আসবে। মহাকাশযানের গা বেয়ে তিনটে গাছ নেমে এল—আমার অতিথির স্বজাতি বলে চিনতে একটুও অসুবিধে হল না। ওরা এগিয়ে আসছিল আমাদের

BanglaBook.org

দিকেই—বন্ধু আমাকে এক বিশেষ ভঙ্গিতে আলতো করে জড়িয়ে রইল। বুঝলাম, ও আমাকে সুখ আর ভালোবাসার কথা বলতে চাইছে। বাকি তিনটে গাছ ততক্ষণে ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। বাতাসে পাতা নড়ার শব্দ হল; আগাছার মতো দেখতে ভিনগ্রহীরা যে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে সেটা বুঝতে আমার কষ্ট হল না। একটু পরে ওরা সবাই মিলে আমার দিকে ফিরে শেষবারের মতো ডালপালা নুইয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ফিরে গেল ওদের যানের দিকে।

...আমার অতিথি চলে গেছে অনেকক্ষণ। ভিনগ্রহের অধিবাসী আমায় শিখিয়ে গেছে—আবেগ-অনুভূতি-অভিমান-ভালোবাসা—সবকিছুর দিক দিয়ে আমাদের সঙ্গে গাছপালার কত মিল!

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অভিযাত্রী

ভ্যালেন্টিনা ঝুরাভলেভা

আমাদের মহাকাশ-মিউজিয়ামের জগতজোড়া খ্যাতি; আমি যে আজ পর্যন্ত একটিবারের জন্যেও এখানে আসিনি—সেটা সত্যিই আশ্চর্যের! আশ্চর্যের কথাটা বলছি এই কারণেই যে আমি নিজে মহাকাশ অভিযানে না বেরলেও, মহাকাশচারীদের শরীর-মন যাতে সুস্থ থাকে সেটা দেখার দায়িত্ব আমার মতো কিছু ডাক্তারের। আমাকে অবশ্য ডাক্তার না বলে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের গবেষক বলাটাই উচিত। আমার গবেষণার বিষয় ঃ মহাকাশচারীদের মন। অন্য গ্রহে পাড়ি দেওয়ার সময় মহাকাশচারীদের মধ্যে যেসব মানসিক উপসর্গ দেখা দেয় সেগুলি নিরাময়ের রাস্তা খুঁজে বের করাটাই আমার কাজ।

হ্যাঁ, মহাকাশচারীদের মধ্যেও মনের রোগ দেখা দেয়। এখনকার এই আয়ন-রকেটের যুগে প্রায় আলোর গতিতে মহাকাশ-পাড়ি দেওয়া সম্ভব হলেও, কাছাকাছি কোনো নক্ষত্রজগতে পৌঁছনো প্রায় বিশ-পঁচিশ বছরের ধাক্কা! এই সুদীর্ঘ সময়ে পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন। মহাকাশযানের যন্ত্রপাতি-কলকব্জা প্রায় সবই স্বয়ংক্রিয়। অতএব মহাকাশপাড়ির সময় মহাকাশচারীদের বছরের পর বছর নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকতে হয় বদ্ধ খুপরির মধ্যে। সে যে কী একঘেয়েমির ব্যাপার, তা বলে বোঝানো মুশকিল। এই জন্যই মহাকাশচারীদের বাছাই করার সময় তাদের মনের জোর যাচাই করে নেওয়া হয়। এছাড়া ওদের প্রত্যেকেরই যাতে নিজস্ব কোনো জোরালো ‘হবি’ থাকে—তা সে গানবাজনা, ছবি আঁকা, মূর্তি গড়া কিংবা বই পড়া—যাই হোক না কেন, সেটাও দেখে নেওয়া হয়। মহাকাশযানের মধ্যে একঘেয়ে সময় কাটাতে এইসব শখ বা হবিগুলি কতটা কার্যকরী—এসবের সাহায্যে মানসিক অস্থিরতা থেকে মহাকাশচারীরা কতটা রেহাই পেতে পারেন, সেটাই আমার গবেষণার বিষয়। মহাকাশ-মিউজিয়ামে আমার এই আসাটাও পুরনো আমলের মহাকাশচারীদের শখ-আহ্লাদ আচার-আচরণ সম্পর্কে খোঁজ নিতে।

মিউজিয়ামের ডিরেক্টরের নাম আমি আগেই শুনেছি। একসময় উনি নিজেও একজন পয়লা সারির মহাকাশচারী ছিলেন। রকেটের জ্বালানির বিস্ফোরণে ওঁর একটা চোখ নষ্ট হয়ে যায়। আমার গবেষণার বিষয় জানিয়ে ওঁকে আগেই চিঠি

BanglaBook.org

দিয়েছিলাম—ফলে, মৌখিক আলাপ সাঙ্গ হতেই সরাসরি কাজের কথায় চলে এলেন উনি। বললেন, 'আপনি প্রথম যুগের মহাকাশচারীদের মনোবল সম্পর্কে জানতে চান তো?'

ঘাড় নেড়ে সায় দিতেই উনি বললেন, 'বার্নার্ডের তারার দিকে প্রথম যে অভিযানটি চালানো হয়েছিল, তার বিস্তারিত বিবরণ নিশ্চয়ই আপনার জানা নেই। আসলে, 'সিরিয়াস', 'প্রোকিওন' বা '৬১-সিগনি'—এদের বিষয়েই আমাদের উৎসাহ বেশি। ওইসব নক্ষত্রে যেসব অভিযান চালানো হয়েছে সেগুলির প্রচারও হয়েছে ভালো। অথচ, 'বার্নার্ডের তারা'র অভিযাত্রীদের—বিশেষ করে ওই অভিযানের নেতা আলেক্সি জারুবিন-এর কাহিনি যদি আপনি না শোনেন, তবে মহাকাশচারীদের মনস্তত্ত্বটাই ঠিকমতো জানা হবে না—'

'আপনার এখানে কি ওই অভিযানের বিষয়ে কোনো কাগজ-পত্র রয়েছে?' আমতা আমতা গলায় জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

'কাগজপত্র? ডকুমেন্ট?' ডিরেক্টর ভদ্রলোক চোখের কালো চশমাটা খুলে রেখেছিলেন টেবিলের ওপর। তারপর মুখে কেমন যেন ম্লান হাসি ফুটিয়ে একটা মোটা ফাইল এগিয়ে দিয়েছিলেন আমার দিকে।

ফাইলটা এখন খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে আমার পড়ার টেবিলে। কাগজগুলোর রং ঈষৎ হলুদ, তবে প্লাস্টিক সলিউশনে ভিজিয়ে নেওয়ার দরুন যথেষ্ট দৃঢ় এবং মসৃণ। আমি একটা একটা করে পাতা উল্টোতে থাকি...

বার্নার্ডের তারার দিকে মহাকাশযান পাঠানোর পরিকল্পনা প্রথম যখন নেওয়া হয়—সেসময় নিউক্লীয় জ্বালানির ব্যবহার শুরু হলেও মহাকাশযানের মধ্যে বিপুল পরিমাণ জ্বালানি মজুত রাখা এবং তার সাহায্যে সেই যানকে পঞ্চাশ-একশো বছর চালু রাখার কায়দা তখনও জানা ছিল না। পৃথিবী থেকে বার্নার্ডের তারার দূরত্ব ছ' আলোকবর্ষের কাছাকাছি। হিসেব করে দেখা গেল—ওই তারার জগৎ থেকে একবার ঘুরে আসতে নিদেনপক্ষে চোদ্দ বছর সময় দরকার। সেসময় যে রকেট ব্যবহার করা হত—তার সাহায্যে নক্ষত্র-অভিযান সম্ভব হলেও মাঝপথে তার ইঞ্জিন বিগড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা যে ছিল না তা নয়। তার ওপর, জ্বালানির পরিমাণ সীমিত। ফলে, ওইরকম একটা বিপদসংকুল অভিযানের নেতাকে খুঁজে বের করতে কর্তৃপক্ষকে রীতিমতো হিমসিম খেতে হয়েছিল। নেতা হিসেবে এমন একজনকে দরকার যার মধ্যে রয়েছে অসাধারণ সাহস, ইঞ্জিনিয়ারিং দক্ষতা, উপস্থিত বুদ্ধি এবং যে কোনো পরিস্থিতিতে চটপট সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা।...

BanglaBook.org

সিলেকশন কমিটির রিপোর্টগুলো উল্টোতে থাকি। হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত আকাঙ্ক্ষিত মানুষটির খোঁজ মিলেছে। নাম অ্যালেক্সি জারুবিন। এরপর মনের মতো সহ-অভিযাত্রীদের বেছে নেওয়ার দায়িত্ব ক্যাপ্টেনের—সেটাই রীতি। এ কাজটা করতে জারুবিন-এর সময় লেগেছে সামান্যই। এমন পাঁচজনের সঙ্গে ও যোগাযোগ করেছে যারা আগে কোনো না কোনো সময়ে ওর সঙ্গে মহাকাশপাড়ি দিয়েছে।'জারুবিনকে নেতা হিসেবে পেলে যে ওরা নির্ভয়ে যে কোনো অভিযানে বেরতে প্রস্তুত তা নির্দ্বিধায় জানিয়ে দিয়েছে ওরা।

অভিযাত্রীদের প্রত্যেকের খুঁটিনাটি বিবরণ আর ছবি রাখা আছে ফাইলে। ক্যাপ্টেন জারুবিনের বয়স তখন ছাব্বিশ; ছবিতে অবশ্য আর একটু বয়স্ক দেখাচ্ছে। নাকটা চোখালো, শক্ত চোয়ালের ওপর ভরাট মুখ; ঢেউ খেলানো চুলের নিচে অসাধারণ দুটি চোখ—শান্ত অথচ বুদ্ধিদীপ্ত।

ক্যাপ্টেনের সঙ্গীদের মধ্যে রয়েছে এক ইঞ্জিনিয়ার দম্পতি; মহাকাশযানের প্রধান চালক হিসেবে যাকে মনোনীত করা হয়েছে—বয়সে সে সকলের চেয়ে বড়। অভিযাত্রীদের মধ্যে আর একজন মহিলাকে পাওয়া যাচ্ছে—পেশায় ডাক্তার। এরা ছাড়া রয়েছে একজন অ্যাস্ট্রোফিজিসিস্ট যার মুখে বেশ বড়সড় এক পোড়ার দাগ—এর আগের এক অভিযানে দুর্ঘটনার স্মৃতিচিহ্ন।

নিজের পেশা ছাড়া কার কীসে উৎসাহ সেটাও বিশদভাবে লেখা আছে রিপোর্টে। প্রধান চালক গানবাজনায় আগ্রহী; গান লিখে তাতে সুর দেন নিজেই। মহিলা ডাক্তারটির আবার আণুবীক্ষণিক জীব সম্পর্কে দারুণ উৎসাহ; ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাইক্রোস্কোপে চোখ লাগিয়ে বসে থাকতে ক্লান্তি নেই। তরুণ অ্যাস্ট্রোফিজিসিস্টের শখ—বিভিন্ন ভাষা শেখা; ইতিমধ্যে পাঁচ-পাঁচটা ভাষা আয়ত্ত করেচে এবং এবারের অভিযানে ল্যাটিন আর গ্রীক ভাষা শিখবে বলে জানিয়ে দিয়েছে। ইঞ্জিনিয়ার দম্পতির আবার দাবায় প্রচণ্ড আসক্তি। ক্যাপ্টেন জারুবিনের শখ—ছবি আঁকা; অয়েল-পেন্টিং-এ বেশ দক্ষতা আছে।

...ফাইলের কাগজ উল্টে যাচ্ছি। বার্নার্ডের তারার দিকে 'পোলাস' নামে যে মহাকাশযানটিকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তার নক্সা আর বিবরণ দেখতে পাচ্ছি। ওটার বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে বসানো হয়েছে পুরনো আমলের এক নিউক্লীয় রিঅ্যাক্টর।

শেষ পর্যন্ত নির্বিঘ্নে যাত্রা শুরু করেছে 'পোলাস'। মহাকাশযানের প্রচণ্ড গতিবেগের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়াটা সহজ নয়; প্রথম প্রথম কাজ করা তো দূরের কথা, নড়াচড়াই দায়! সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য মহাকাশচারীদের মধ্যে জীবনের স্বাভাবিক ছন্দগুলি ফিরে আসে। কম্পিউটারের নির্দেশ অনুযায়ী যাবতীয় যন্ত্রপাতি ঠিকমতো কাজ করছে কি না তার খবরদারি শুরু হয় তখন।

BanglaBook.org

'পোলাস' যাত্রা শুরু করার পর বেশ কিছুদিন পর্যন্ত কোথাও কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। যন্ত্রপাতিগুলি যে সন্তোষজনকভাবে কাজ করছে তা লগবুকে লেখা হয়েছে প্রতিদিন। তারপরই এক জায়গায় লেখা—'গতরাত্রে আমরা শেষবারের মতো পৃথিবীর টেলিভিশন অনুষ্ঠান দেখেছি। টেলিভিশনের পরদায় এখন আর কিছু ধরা পড়ছে না।'

পৃথিবীর সঙ্গে বেতার যোগাযোগ অবশ্য তখনও পুরোপুরি ছিন্ন হয়নি। রেডিওয় পৃথিবীর খবরাখবর ওরা পেয়েছে আরও বারো দিন। তারপর 'পৃথিবী' নামক গ্রহটা আকাশের গায়ে শুধুই যেন একটা আলোর টিপ। সেই টিপ-টাও হারিয়ে গেল দিনকয়েক পর।

......বিপর্যয়টা এল কোনোরকম জানান না দিয়েই।

সাতমাস পরের কথা সেটা। একদিন হঠাৎ রিঅ্যাক্টরের কাজকর্মে কিছু অসঙ্গতি দেখা দিল। অবস্থাটা বেশিক্ষণ স্থায়ী না হলেও ক্ষতি যা হওয়ার হল। মূল্যবান জ্বালানির একটা বড় অংশ নষ্ট হয়ে গেল যন্ত্রের খামখেয়ালীপনায়!

অপরিচিত আওয়াজে চোখ সরালাম ফাইল থেকে। জানলার সামনে গল্প করতে করতে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে এক ঝাঁক মেয়ে। ওদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার মনের মধ্যে ভেসে উঠল ছ-ছটা উৎকণ্ঠিত মুখ। অমন অভাবনীয় বিপর্যয়ের পর কী করেছিল ওরা?

......গ্রিন-হাউসের পাশে খানিকটা খোলা জায়গা। তারই দেয়ালে ইজেল টাঙিয়ে ছবি আঁকছে জারুবিন; পাশে ছোট্ট ডেস্ক-কম্পিউটারের সামনে বসে ক্রমাগত চাবি টিপে চলেছে আর একজন।

'কেন শুধু শুধু কম্পিউটারকে খাটাচ্ছ, নিকোলাই?' তুলি নামিয়ে রেখে জিজ্ঞাসা করে ক্যাপ্টেন। 'আমরা তো আগেও একাধিকবার হিসেবগুলো করেছি।'

'কী হবে এখন?'

'কী আবার হবে,' ক্যাপ্টেন ঘড়ির দিকে তাকায়, 'একটু পরেই খাবার ঘণ্টা পড়বে। খাবার টেবিলে বসেই না হয় সবাই মিলে আলোচনা করা যাবে।'

'বেশ, আমি তাহলে সবাইকে গিয়ে জানিয়ে আসি।' লম্বা করিডর ধরে এগিয়ে যায় নিকোলাই।

ঠিক দশমিনিট বাদে মেস-ঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢোকে ক্যাপ্টেন। পাঁচজনই বসে আছে গোল টেবিল ঘিরে। প্রত্যেকের গায়ে মহাকাশচারীর ইউনিফর্ম। ওদের চোখমুখ দেখেই বোঝা যায়—পরিস্থিতির গুরুত্ব সম্পর্কে ওরা কতটা সজাগ।

'দেখছি, আমি একাই ইউনিফর্মটা পরতে ভুলে গেছি—'লজ্জিত গলায় বলে ওঠে ক্যাপ্টেন।

BanglaBook.org

কারোর মুখে টুঁ শব্দ নেই। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে কথা শুরু করে জারুবিন, 'আপনারা তো সবাই ঘটনাটার গুরুত্ব বুঝতে পারছেন। আমাদের এখন কী করণীয় সে বিষয়ে সকলের মতামত জানা দরকার। লীনা, তোমার বয়স যেহেতু কম, তুমিই শুরু করো।'

'আমি তো একজন ডাক্তার; এখনকার সমস্যাটা যখন যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত তখন আমার মতামতটা সবশেষে জানানোই ভালো।' লীনা উত্তর দেয়।

'তুমি আমাদের মধ্যে বয়সে সবচেয়ে ছোট এবং সবচেয়ে বিচ্ছু!' ক্যাপ্টেনের মুখ থেকে গাম্ভীর্যের থমথমে মেঘটা একটু যেন সরে যায়। 'তুমি যে ইতিমধ্যে মনস্থির করে ফেলেছ তা আমার জানতে বাকি নেই। তবু সকলের মতামত না শুনে যখন মুখ খুলবেই না তখন আর কী করা যায়? যাকগে, আপনিই না হয় শুরু করুন মিস্টার সের্গেই।'

'আমি বুঝতে পারছি না—আমাদের জ্বালানি যেটুকু নষ্ট হয়েছে তাতে অন্তত বার্নার্ডের তারায় পৌঁছতে কোনো অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।' বলে ওঠে অ্যাস্ট্রোফিজিসিস্ট। 'এখান থেকেই পৃথিবীতে ফিরে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না নিশ্চয়ই।'

'কিন্তু একবার ওখানে পৌঁছনোর পর পৃথিবীতে ফিরে আসার জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানি যে অবশিষ্ট থাকবে না সেটা তো নিশ্চিত। সেক্ষেত্রে, মাঝরাস্তা থেকে ফিরে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ নয় কি?'

'না, ক্যাপ্টেন,' মাথা নাড়ে সের্গেই, 'বার্নার্ডের তারায় পৌঁছনোর পর আমরা আর কোনোদিন পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারব না, আপনার এ কথাটি মানতে আমি রাজি নই। মহাকাশ-বিজ্ঞানের যে হারে উন্নতি হচ্ছে, তাতে অদূর ভবিষ্যতে অন্য কোনো উদ্ধারকারী রকেট যে আমাদের নিতে আসবে না তা কে বলতে পারে? আমাদের অসহায় অবস্থার কথা আঁচ করে পৃথিবীর মানুষ নিশ্চয়ই চুপ করে বসে থাকবে না।'

'তাহলে, আমাদের এগিয়ে যাওয়াটাই সাব্যস্ত হল?' হাসিমুখে প্রধান চালকের দিকে তাকায় ক্যাপ্টেন। 'জর্জি, আমাদের এই 'পোলাস'-কে সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বটা আপনার; সের্গেই-এর সঙ্গে কি আপনি একমত?'

'এখান থেকে ফিরে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।' জর্জির চটপট উত্তর। 'আমাদের পথ যে যথেষ্ট বিপদসঙ্কুল, এ অভিযানের শুরুতেই তো কি আমরা জানতাম না? অনিশ্চিতের মুখে এগিয়ে যাবার অঙ্গীকারই তো আমরা করেছিলাম—তাই নয় কি?'

'অনিশ্চিতের মুখে এগিয়ে যাওয়া—কথাটা ঠিক বলেননি। তা আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের মতামতটা এবারে জানতে হয়। নিনা, নিকোলাই—বলো কিছু।'

BanglaBook.org

'আমাদের এই অভিযানের উদ্দেশ্য—বার্নার্ডের তারা'র জগৎ সম্পর্কে বিস্তারিত খবরাখবর নেওয়া—তাই তো?' উঠে দাঁড়ায় নিকোলাই। 'ধরা যাক, ওখানে গিয়ে নতুন কিছু আবিষ্কার করলাম আমরা। যেহেতু আর ফিরে আসার সম্ভাবনা প্রায় নেই-ই, পৃথিবীর মানুষকে আমাদের আবিষ্কৃত কোনো তথ্যই পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছি না। সেক্ষেত্রে আমাদের এই অভিযানের মূল্য কী? শুধু তাই নয়, আমরা যদি এক্ষুনি ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই—তবে আগামী বছর দুয়েকের মধ্যেই নতুন করে আর একটা অভিযানের কথা হয়তো ভাবা যাবে; আর যদি না ফিরি, আমাদের অপেক্ষায় পৃথিবীর মানুষকে বসে থাকতে হবে আরও প্রায় চোদ্দটা বছর! সেদিক থেকে তো মনে হয়—পৃথিবীতে এই মুহূর্তে আমাদের ফিরে যাওয়াই উচিত।'

মহিলা-ডাক্তারটি এবারে মুখ খোলে। বলে, 'আপনি নিজে কী মনে করেন ক্যাপ্টেন?'

'মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়ে জারুবিন বলে ওঠে, 'আমার তো মনে হয়, ইঞ্জিনিয়ারদের কথাই ঠিক। ওদের মতামতে আবেগ নেই, কিন্তু যুক্তি আছে। সত্যিই তো, আমরা যখন আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছি, তার ফলাফল পৃথিবীর মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে না পারলে, এই অভিযান-ই তো অর্থহীন!'

সবার নিস্পন্দ মুখের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ক্যাপ্টেন বলতে থাকে, 'আসলে, দুটো রাস্তা এখন আমাদের সামনে খোলা রয়েছে। এক—আমরা আর সময় নষ্ট না করে—পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারি; দুই—জ্বালানির অভাব সত্ত্বেও আমাদের লক্ষ্য—বার্নার্ডের তারার কোনো একটা গ্রহে গিয়ে পৌঁছতে পারি এবং সেখান থেকে পৃথিবীতে ফিরেও আসতে পারি।'

'সেটা কীভাবে সম্ভব?' বিস্ময়ে চোখ দুটো বড় বড় হয়ে ওঠে নিকোলাই-এর। 'যথেষ্ট জ্বালানি না থাকলে ফিরব কী করে?'

'আমারও সেটা জানা নেই। তবে বার্নার্ডের তারায় পৌঁছতে এখনও বহুমাস বাকি। এর মধ্যে পৃথিবীতে ফিরে আসার কোনও একটা উপায় নিশ্চয়ই আমরা খুঁজে বের করতে পারব।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন।' ক্যাপ্টেনের কথায় সায় দেয় নিকোলাই। 'আমরা এগিয়েই যাব।'

'তাছাড়া ক্যাপ্টেন, আপনার ওপর সম্পূর্ণ আস্থা রয়েছে আমাদের সকলের।' লীনা বলে ওঠে। 'বার্নার্ডের তারায় পৌঁছনোর পর আমাদের মজুত জ্বালানির মাত্র আঠারো শতাংশ অবশিষ্ট থাকবে—প্রয়োজনের তুলনায় যা খুবই কম। তবু আপনার কথাই ঠিক; ওই জ্বালানিটুকুর সাহায্যে 'পোলাস'-কে পৃথিবীতে ফিরিয়ে

BanglaBook.org

আনার উপায় নিশ্চয় বেরবে। জর্জির সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলছি, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত বলেই না আমাদের এই অভিযান এত রোমাঞ্চকর!'

'ক্যাপ্টেন জারুবিন-এর আঁকা কোনো ছবি আছে আপনাদের মিউজিয়ামে?' ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা হতেই জিজ্ঞাসা করলাম।

'হ্যাঁ, অবশ্যই।' বলেই ভদ্রলোক আমাকে ওপরের একটা ঘরে নিয়ে গেলেন।

.........সবসুদ্ধ গোটা দশেক ছবি; সবগুলো তেলরঙে আঁকা। একটা ছবিতে দেখি—নীল আকাশের বুকে ভেসে বেড়াচ্ছে দুটি ছেলেমেয়ে; পিঠে তাদের পক্ষীরাজের ডানা। আর একটা ছবিতে—অজানা এক গ্রহের আকাশে দু-দুখানা সূর্য! সূর্যের রং ঈষৎ কমলা।

'অভিযানের পুরো রিপোর্টটা কি পড়া হয়েছে?' ডিরেক্টর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেন আমায়।

'আজ্ঞে, না। আজই শেষ করতে পারব বলে আশা করছি।'

......পাতার পর পাতা উল্টে যাচ্ছি। 'পোলাস'-এর যাত্রাপথের খুঁটিনাটি বিবরণ। শেষ পর্যন্ত বার্নার্ডের তারার চৌহদ্দির মধ্যে পৌঁছনো গেল। না, পৃথিবীতে ফিরে যাওয়ার কোনো উপায় এখনও মাথায় আসেনি কারোর। আশার আলো দেখা যাচ্ছে না......

একসময় বার্নার্ডের তারার একটি গ্রহে গিয়ে নেমেছে 'পোলাস'। গ্রহটি সম্পর্কে বিস্তারিত লেখা হয়েছে লগ বুকে। বিশুদ্ধ অক্সিজেনে পরিপূর্ণ ওখানকার বাতাস; অথচ কোথাও কোনো উদ্ভিদ অথবা প্রাণীর চিহ্ন নেই! ওখানকার তাপমাত্রা অবশ্য জীবনধারণের পক্ষে প্রতিকূলই বলতে হবে। থার্মোমিটারের পারা শূন্যের প্রায় পঞ্চাশ ডিগ্রি নিচে থেকেছে সবসময়।

এরপর পাতার পর পাতা জুড়ে গ্রহটির বিবরণ লেখা হয়েছে; সেখানকার মাটি এবং হাওয়ার নমুনা ভরে নেওয়া হয়েছে পলিথিনের ব্যাগে। পৃথিবীর গাছপালা ওখানে টিকবে কিনা—সে বিষয়ে সংক্ষিপ্ত পরীক্ষা চালানো হয়েছে।

অবশেষে, একদিন সবাইকে ডেকে ক্যাপ্টেন বলল, 'ফেরার জন্য এবারে তৈরি হোন আপনারা—'

প্রায় আদেশের সুরেই যেন বলে চলে জারুবিন, 'এটা ঠিকই যে প্রয়োজনের তুলনায় মাত্র এক-তৃতীয়াংশ জ্বালানি পড়ে রয়েছে ট্যাঙ্কে; তবু এর সাহায্যেও পৃথিবীতে ফিরে যাওয়া সম্ভব হতে পারে যদি আমরা রকেটের ওজন বেশ খানিকটা কমিয়ে ফেলতে পারি। আমি বলি কি, ভারী ইলেকট্রনিক সরঞ্জামগুলো খুলে নেওয়া হোক; 'পোলাস'-এর ভেতরে যেসব পার্টিশন-দেয়াল আছে,

BanglaBook.org

সেগুলিরও প্রয়োজন নেই। সবচেয়ে জরুরি কথাটা হল, যাত্রা শুরুর পর মহাকাশযানের গতিবেগ বাড়ানোর হারটা কম থাকে বলে জ্বালানির বেশ খানিকটা অংশ নষ্ট হয়। আমার ধারণা—স্বাভাবিকের চেয়ে চারগুণ বেশি অ্যাক্সিলারেশন-এ যাত্রা শুরু করলে, জ্বালানির একটা বড় অংশ বাঁচানো সম্ভব হবে।

'তা, কী করে হয়?' নিকোলাই প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে। 'ওই প্রচণ্ড অ্যাক্সিলারেশনের মধ্যে কোনো চালকের পক্ষেই মহাকাশযানের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়।'

'ঠিকই, যদি সেই চালক মহাকাশযানের ভেতরে থাকে।' শান্ত গলার বলে ওঠে ক্যাপ্টেন। 'সেজনই ঠিক করেছি; প্রথম বেশ কয়েকমাস 'পোলাস'-এর যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম নিয়ন্ত্রিত হবে এই গ্রহ থেকে, এবং সেই কাজটা করব আমি নিজে। জানি, আপনারা আমায় বাধা দেবেন। সেক্ষেত্রে, আপনাদের মনে করিয়ে দিই—ক্যাপ্টেনের সিদ্ধান্তই চরম। তা মেনে নেওয়া ছাড়া আপনাদের কিছু করার নেই।'

ক্যাপ্টেন জারুবিন-এর নির্দেশে মহাকাশযান নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নামানো হল গ্রহের মাটিতে। ওর থাকার জন্য ছোট একটা ঘর বানানো হল; প্রয়োজনমতো খাবারদাবারও রাখা হল, তবে বছরের পর বছর ধরে ওই হিমশীতল গ্রহে শরীরকে উত্তপ্ত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানি দেওয়া গেল না কিছুতেই।

ঠিক যেমনটা চাওয়া হয়েছিল, তেমনিভাবে যাত্রা শুরু করেছিল 'পোলাস'। প্রথম কয়েক মাস ক্যাপ্টেনের গলার স্বর বাতাসে ভেসে এসেছিল অভিযাত্রীদের কাছে—তারপর তাও হারিয়ে গেল চিরকালের মতো!

রিপোর্টটা পড়া শেষ। ওটা ফেরত দেওয়ার উদ্দেশ্যেই আবার গেলাম ডিরেক্টরের ঘরে।

'আসুন, আসুন।' সাদর-অভ্যর্থনা জানালেন ভদ্রলোক। 'চলুন, পাশের ঘরে গিয়ে বসি।'

পাশের ঘরটা অনেকটা ড্রয়িংরুমের মতো; সুন্দর সব সোফা। দেয়ালের মাঝামাঝি একটা বড় ছবি। ওটার দিকে আঙুল দেখিয়ে ডিরেক্টর বললেন, 'ওই যে দেখছেন—ওটাই হল ক্যাপ্টেন জারুবিন-এর আঁকা শেষ ছবি।'

'কী বলছেন?' আমি চমকে উঠি। 'ক্যাপ্টেন কি শেষ পর্যন্ত ফিরে আসতে পেরেছিলেন?'

'না, সে প্রশ্ন ওঠেই না।' ভদ্রলোক চশমাটা খুলে কাচ মোছেন। 'জারুবিন

BanglaBook.org

জানত, কোনোদিনই আর সে পৃথিবীর মুখ দেখবে না। সত্যি বললে, পাঁচজন সঙ্গীকে বাঁচাতে গিয়ে একরকম আত্মহত্যাই করেছিল ও। বার্নার্ডের তারার সেই অচেনা-অজানা গ্রহে মারা যাওয়ার আগে এই ছবিটাই এঁকেছিল ক্যাপ্টেন।'

ছবিটার দিকে ভালো করে তাকাই। একটা চওড়া রাস্তা বহুদূর চলে গেছে; একটা ঝাঁকড়া গাছ তার ডালপালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই রাস্তার ধারে।

ডিরেক্টর আমার কাঁধে হাত রাখেন; বলেন, 'চোদ্দ বছর পর সেই গ্রহে পৌঁছে ছবিটা উদ্ধার করেছিলাম আমি। ছবিটার সঙ্গে একটা চিরকুটও ছিল।

'আপনি নিজে গিয়েছিলেন?' নতুন বিস্ময়ে ডিরেক্টরের মুখের দিকে তাকাই। 'কী লেখা ছিল ওই চিরকুটে?'

'ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হলেও এগিয়ে চলো!' ডিরেক্টর রুমাল বের করে চোখটা মুছে নেন।

আমি আবার ছবিটার দিকে তাকাই। চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক নিঃসঙ্গ মানুষের মুখ; অচেনা গ্রহে বসে ছবিতে তুলির টান দিচ্ছে। আশ্চর্য! জীবনের শেষ ছবিটা আঁকতে বসে পৃথিবীর কথাই মনে পড়েছিল লোকটার—পৃথিবীর গাছ, পৃথিবীর পথ—

নাকি, এগিয়ে চলার প্রতীক হিসেবেই পথটাকে এঁকেছিল ক্যাপ্টেন? মনে মনে সেটাই বোঝার চেষ্টা করতে থাকি।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

বড়দিনের তারা

আর্থার সি ক্লার্ক

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, তিনি যা কিছু করেন তা জগতের কল্যাণের জন্য—এ কথা এখন আর আমি মানতে পারছি না। হ্যাঁ, আমার মতো ধর্মভীরু খ্রিস্টান, যার ধার্মিকতা এখনও বন্ধুবান্ধব—সহকর্মীদের হাসিঠাট্টার খোরাক জোগায়—হায়, সেই আমিও কিনা শেষে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস হারালাম! এর জন্য যে দায়ী, সেই সিক্সথ্ জেনারেশন কম্পিউটারটা আমার সামনে রয়েছে এখনও। আমাদের এবারকার অভিযানে যে বিপুল তথ্য আমরা পেয়েছি, যে অসংখ্য ছবি আমরা তুলেছি—ওই কম্পিউটার তা নির্ভুলভাবে বিশ্লেষণ করে যে সত্যটুকু আবিষ্কার করেছে তা জেনে আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছি; আমার এতদিনের সযত্ন-লালিত বিশ্বাস ভেঙে খান্ খান্ হয়ে গেছে!

পৃথিবীর ইতিহাসে আমাদের আগে কেউ কখনও এতদূরের অভিযানে বেরয়নি। পৃথিবী থেকে 'ফিনিক্স নীহারিকা'—লক্ষ কোটি মাইল পাড়ি দিয়েছি আমরা। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটেছে মহাকাশযানের ঢাউস পেটের মধ্যে। তারপর সেই একঘেয়ে বিরক্তিকর দিনগুলির শেষে যখন ফিনিক্সের চৌহদ্দিতে গিয়ে পৌঁছলাম—আমাদের অবস্থা তখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচার মতন!

ফিনিক্স-কে নীহারিকা বলাটাই সবচেয়ে বড় ভুল। ওটা আসলে একটা ছোট্ট তারা, অথবা তারা'র ভগ্নাবশেষ বলাটাই ভালো। তাকে ঘিরে পাক খাচ্ছে বস্তুকণার রাশি; ওগুলো জমাট বেঁধেই হয়তো নতুন গ্রহনক্ষত্র তৈরি হবে একদিন। সে অবশ্য দূর-ভবিষ্যতের কথা। এখন ওগুলোকে ঘন মেঘ ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না। আর সেই মেঘের শেষ প্রান্তে রয়েছে একটা ছোট্ট গ্রহ; তারাটির ভগ্নাবশেষকে ঘিরে এখনও যা আবর্তিত হচ্ছে অতি ধীর বেগে।

ফিনিক্স-নীহারিকার স্বরূপ আমাদের অনেকদিন থেকেই জানা। প্রতি বছর আমাদের ছায়াপথে একশোরও বেশি তারা'র ঔজ্জ্বল্য হঠাৎ অনেকটা বেড়ে যায়। তারাগুলির মধ্যে বিস্ফোরণের দরুনই যে এমনটা ঘটে তা এখন আমাদের জানা। কয়েক ঘণ্টা অথবা কয়েকদিন ধরে আকাশকে আলোর দীপ্তিতে ভরিয়ে

BanglaBook.org

দিয়ে সে তারার ঔজ্জ্বল্য কমতে থাকে একটু একটু করে; তারপর আবছা হতে হতে একসময় আকাশ থেকে তার শেষ আলোটুকুও মুছে যায়। এখন থেকে হাজার বছর আগেও এ ঘটনা মানুষের চোখে পড়েছে। হঠাৎ করে যেসব তারা'রা জ্বলে ওঠে তাদের 'নতুন তারা' ভেবে নিয়ে নাম দেওয়া হয়েছিল 'নোভা'। ল্যাটিন ভাষায় নোভা-র অর্থ নব।

ফিনিক্সে বিস্ফোরণ ঘটেছিল এখন থেকে দু-তিন হাজার বছর আগে। কোনো কোনো নক্ষত্র কেন যে হঠাৎ নিজের মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আত্মহননের পথ বেছে নেয় সে সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার জন্যই ফিনিক্স-এ অভিযান চালানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়। তাকে কেমন চেহারায় দেখব, তার একটা আন্দাজ অবশ্য আগেই করা হয়েছিল। কারণ আমরা জানতাম, যে তারা বেহিসেবির মতো হু হু করে নিজের আলো-তাপকে খরচ করে ফেলে, তা শেষে কৃপণের মতো নিজের অবশিষ্ট ধনকে আগলে রাখে। এককালে যা ছিল সূর্যের চেয়েও বড় এক জ্বলন্ত নক্ষত্র—নিজের শরীর খুবলে বস্তুকণাদের বের করে মহাকাশের বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়ে সে তখন এক খুদে গোলকের আকার নেয়। আয়তন তখন তার পৃথিবীর মতো হলেও, ওজনে সে পৃথিবীর চেয়ে লক্ষগুণ ভারী! কোটি কোটি মাইল ছড়িয়ে থাকা মেঘের মাঝে যেন ছোট্ট একটা আলোর টিপ—জ্যোতির্বিদদের ভাষায় 'শ্বেতবামন তারা'।

ফিনিক্স-নীহারিকার ওই কেন্দ্রবিন্দুকে লক্ষ করেই আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম। শেষ পর্যন্ত একদিন গিয়ে পৌঁছলাম তাকে ঘিরে থাকা ধুলো আর মেঘের রাজত্বে।

আমাদের যন্ত্রপাতিগুলো নিখুঁতভাবে কাজ করছিল। নীহারিকার কেন্দ্রে প্রায় পৌঁছে গেছি। আমাদের সামনে খুদে নক্ষত্র। একসময় ওটাই নাকি ছিল গনগনে সূর্যের মতো। লক্ষ-কোটি বছরে যে আলো-তাপ ফুরনোর নয়—নিজের খেয়ালখুশিতে কয়েকঘণ্টায় তার প্রায় সবটাই খরচ করে ফেলে, এখন ভুল শোধরানোর পালা! নক্ষত্রের এত কাছে, তবু তাপের আঁচটুকুও যেন টের পাচ্ছি না।

ওই একরত্তি নক্ষত্রকে ঘিরে কোনো গ্রহের যে অস্তিত্ব থাকতে পারে প্রথমটায় তা কল্পনাই করিনি আমরা। আগে যদি কোনো গ্রহ থেকেও থাকত—ফিনিক্সে বিস্ফোরণের পর আগুনের প্রখর তাপে তার সেটা উবে যাওয়ারই কথা। তবু আমাদের সন্ধানী-যন্ত্রকে রুটিন-মাফিক কাজে লাগিয়েছিলাম—যদি কোথাও

BanglaBook.org

কোনো গ্রহের সন্ধান পায়। আর তাতেই, আমাদের সূর্য থেকে প্লুটোর যা দূরত্ব, তার চেয়েও দূরে এক খুদে গ্রহের খোঁজ মিলল। নক্ষত্র থেকে অতদূরে থাকার দরুনই হয়তো আগুনের আক্রোশ থেকে বেঁচে গেছে। গ্রহটার খোঁজ পাওয়ার পর ওখানে প্রাণের অস্তিত্ব আছে কিনা তা না জেনে পৃথিবীতে ফিরে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। অতএব সেই গ্রহে যাওয়াটাই সাব্যস্ত হল।

ন্যাড়া পাথুরে গা, গাছপালার কোনো চিহ্ন নেই। ফিনিক্সের একমাত্র গ্রহটির কাছে পৌঁছনোর ঢের আগেই অবশ্য বুঝেছিলাম— ওখানে জীবন্ত কোনো প্রাণীর সঙ্গে মোলাকাতের সম্ভাবনা থাকতে পারে না। ফিনিক্সে যে বিস্ফোরণ ঘটেছিল তার তাপে ওখানকার মাটির ওপরে বায়ুমণ্ডলের কোনো চিহ্ন নেই আর। তবু আমরা ওই গ্রহে নামার পরিকল্পনা নিলাম। কারণ—আমাদের শক্তিশালী ক্যামেরায় ওখানকার পাথুরে জমির ওপর একটা সুবিশাল স্তম্ভ ধরা পড়েছিল। স্তম্ভের মসৃণ ছাদে নানারকম জ্যামিতিক চিহ্ন আঁকা; ওগুলো যে বুদ্ধিমান প্রাণীর কীর্তি তা বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। বেশ বোঝা যায়— ওখানকার বাসিন্দারা কোনো এক সময়ে অনেক যত্নে ওই পাহাড়-সমান উঁচু স্তম্ভটা বানিয়েছিল—গ্রহান্তরের মানুষদের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে। তাছাড়া আমাদের ডিটেক্টর-এ নির্দিষ্ট মানের তেজস্ক্রিয় বিকিরণের অস্তিত্ব ধরা পড়েছিল। ওই অচেনা গ্রহের মানুষরা নিশ্চয়ই জানত—প্রাকৃতিক কোনো কারণে স্মৃতিস্তম্ভ ধ্বংস হলেও—ওদের ওই তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ব্যবস্থা এক উন্নত সভ্যতার স্বাক্ষর বয়ে চলবে অনন্তকাল ধরে।

স্মৃতিস্তম্ভের কাছে পৌঁছতেই একটা ব্যাপার আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। ওর চূড়াটার নিচে যে প্রকাণ্ড বাড়ি,—সেটা বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে নিয়েই তৈরি হয়েছিল। বাড়িটার চারপাশে উঁচু পাথরের চাঁই। তবু তার ফাঁক দিয়েই অদ্ভুত স্থাপত্য নজরে এল। বাড়িটার কোথাও কোনো ফাঁকফোঁকর নেই। এর অর্থ একটাই হতে পারে। গ্রহের অধিবাসীরা আসন্ন ধ্বংসের আঁচ পেয়ে নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি-জীবনধারার পরিচয় নিশ্চয়ই রেখে গেছে ওই গৃহের মধ্যে—গ্রহান্তরের আগন্তুকদের কৌতূহল চরিতার্থের জন্যই।

না, আমাদের কাছে পাথরের পুরু দেয়াল কাটার উপযোগী আধুনিক যন্ত্রপাতি ছিল না। ফলে পাথর ড্রিল করতে হল সেই প্রাচীন কায়দায়। দেয়াল সরতেই চোখের সামনে খুলে গেল প্রাক্তন গ্রহবাসীদের বিপুল ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার। সে ঐশ্বর্য যে এক পুরুষের সঞ্চয় নয় তা বুঝতে আমাদের কারোরই কষ্ট হয়নি।

BanglaBook.org

ওদের মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে তার সংকেত নিশ্চয়ই বহু বছর আগেই পেয়েছিল ওরা। অনেক চিন্তাভাবনার পরই হয়তো স্মৃতিস্তম্ভ গড়ার পরিকল্পনা নিয়েছিল গ্রহবাসীরা। তারপর ধীরে সুস্থে বছরের পর বছর ধরে একে একে নিজেদের পরিশ্রমের ফসলগুলিকে সৌন্দর্যে রাঙিয়ে থরে-থরে সাজিয়ে রেখেছিল ওদের সেই সুবিশাল স্মৃতিকক্ষে। ওরা জানত, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ইতিহাস থেকে সম্পূর্ণ মুছে না যাওয়ার ওটাই হল একমাত্র রাস্তা। একদিন না একদিন কেউ এসে ওদের ঐশ্বর্যের হদিস পাবেই—এমন একটা বিশ্বাস নিশ্চয়ই ওদের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে গেছিল!

সবকিছু ছিল ওদের। ওরা নিজেদের সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহে স্বচ্ছন্দে যাতায়াত চালাত। কেবল অন্য কোনো নক্ষত্রে পাড়ি দেওয়ার মতো প্রযুক্তিটাই আয়ত্ত করতে পারেনি। অবশ্য তা পারলেও কী আর গ্রহের সমস্ত লোককে বহু আলোকবর্ষ দূরের কোনো নক্ষত্রজগতে সরিয়ে ফেলা সম্ভব হত?

ওদের ছবি আর মূর্তিগুলি দেখে আমরা চমকে উঠেছিলাম। ওদের চেহারার সঙ্গে পৃথিবীর মানুষের কী অসম্ভব মিল! ওদের রেখে যাওয়া অসংখ্য ফিল্ম পাওয়া গেল; প্রোজেক্টরের সাহায্যে ওগুলোকে পরদায় ফেলতেই ওদের চলাফেরা, কাজকর্ম—সব জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠল। হাজার হাজার বছর আগে রেকর্ড করা ওদের সুরেলা কণ্ঠস্বরে গমগম করতে লাগল চারধার। ওদের ভাষা যাতে আমরা শিখে নিতে পারি তারও বন্দোবস্ত করে রেখেছিল ওরা। সহজ সরল ভাষা—রেকর্ড বাজিয়ে তা শিখে নিতে আমাদের বেশি সময় লাগেনি। তারপরই ওদের গান, ওদের কথা, ওদের আনন্দ—সব কিছু অর্থবহ হয়ে ধরা দিল আমাদের কাছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানে যথেষ্ট উন্নত হয়েও অনাড়ম্বর জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত—ওদের সম্পর্কে এমন ধারণাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল আমাদের মনে। স্মৃতিকক্ষ তন্ন তন্ন করে হাতড়েও আমরা এমন কোনো জিনিস পেলাম না যাতে মনে হয়—ওই গ্রহের বাসিন্দাদের মধ্যে কখনও কোনো যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটেছে! ওদের চরিত্রের এই দিকটাই আমাদের বিস্মিত করেছিল সবচেয়ে বেশি।

কে জানে, পৃথিবী থেকে বহু আলোকবর্ষ দূরে ছিলাম বলেই বোধহয় আমাদের মতো অথবা আমাদের চেয়েও উন্নত এক সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ দেখে আমরা সকলেই কেমন আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলাম। তা না হলে, পৃথিবীতেও তো প্রাচীন সব সভ্যতার নিদর্শন মাটি খুঁড়ে বের করা হয়েছে। কই সেগুলো দেখে কোনো পুরাতাত্ত্বিক অথবা পর্যটকের মন দুঃখে গলে গেছে এমনটা তো কখনও শুনিনি।

BanglaBook.org

আমার সহ-অভিযাত্রী ম্লান হেসে জিজ্ঞাসা করেছে, 'আচ্ছা, তোমার ঈশ্বর কি এই গ্রহের বাসিন্দাদের ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারতেন না?'

আমার মুখে কোনো উত্তর জোগায়নি। আমি বলতে পারিনি, আমাদের সর্বশক্তিমান পিতা যা করেন তা মঙ্গলের জন্যই। সত্যি তো, ওই সব নিষ্পাপ-সহজ-সরল মানুষদের এমন পরিণতি কি আদৌ কাম্য ছিল?

আমি জানি, আমার বন্ধুরা পৃথিবীতে ফিরে গিয়ে বলবে, 'আমরা একটা মৃত গ্রহ দেখে এলাম। একসময় ওখানে জলবাতাস ছিল, পাখি গান গাইত, বুদ্ধিমান প্রাণীদের এক উন্নত সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। নেহাত প্রাকৃতিক কারণেই গ্রহটি এখন নিষ্প্রাণ; ওখানকার ফুল-পাখি-মানুষ—সব মরে গেছে হাজার হাজার বছর আগে। না, বেঁচে থাকার মতো পরিবেশ আর নেই ওখানে। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। প্রতিবছরই কত নক্ষত্রে বিস্ফোরণ ঘটে—তাদের গ্রহগুলো সব ধ্বংস হয়ে যায়। সেইসব গ্রহের কোনো কোনোটায় সভ্য প্রাণীও নিশ্চয়ই থাকে। তাদের স্বভাবচরিত্র ভালো না মন্দ, তার ওপর নিশ্চয়ই তাদের বাঁচা-মরা নির্ভর করে না।'

নাহ্, ওখানকার সভ্যতা ধ্বংসের জন্য ঈশ্বরকে ওরা অবশ্যই দায়ি করবে না, কারণ ঈশ্বরের অস্তিত্বেই ওদের বিশ্বাস নেই।

না, না, এমনভাবে ব্যাপারটাকে দেখতে আমি রাজি নই। যারা ঈশ্বর মানে না—তাদের সেই না-জানার মধ্যে আবেগটাই বড় হয়ে দেখা দেয়। আমি তো আর নাস্তিক নই। আমি জানি, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তাঁর কাজকর্মের জন্য আমাদের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নন। তিনি তাঁর খুশি মতো কোনো জগৎ যেমন গড়াতে পারেন তেমনি তা ধ্বংসও করতে পারেন নির্দ্বিধায়। তাঁর কাজের ভালোমন্দ বিচারের কোনো অধিকার নেই আমাদের।

না, এসব কথা মেনে নিতে আমার মনে কোনো দ্বিধা নেই। তবু কখনও কখনও এমন ঘটনাও ঘটে যখন বুকের অতল গভীরে সযত্ন-লালিত বিশ্বাসটা নাড়া খেয়ে যায়। দুর্ভাগ্যবশত আমার ক্ষেত্রে সেই ঘটনাটাই ঘটে গেল।

ফিনিক্সের বিস্ফোরণটা যে কয়েক হাজার বছর আগে ঘটেছিল তা আমাদের জানা থাকলেও একেবারে সঠিক দিনক্ষণটা আমি মাপতে পেরেছিলাম—ওই গ্রহের মাটি-পাথরের রাসায়নিক বিশ্লেষণের পর। এখন জানি, ঠিক কবে ওই নক্ষত্র জ্বলে উঠে ওর গ্রহজগৎকে ধ্বংস করেছিল, আর কবে সেই বিস্ফোরণের আলো এসে ধরা দিয়েছিল পৃথিবীর মানুষের চোখে। আমি এখন বেশ বুঝতে

BanglaBook.org

পারি—সেদিন পৃথিবীর পূর্বদেশের আকাশে সূর্যোদয়ের ঠিক আগের মুহূর্তে নতুন এক তারা-কে অপূর্ব দীপ্তি নিয়ে জ্বলে উঠতে দেখে কতটা বিস্মিত হয়েছিল লোকেরা।

না, আমার কম্পিউটারের হিসেবে কোনো ভুলচুক থাকতে পারে না। দুহাজার বছরের রহস্যের জট খুলেছি আমি। আর তাই তো ঈশ্বর—তোমার কাছে জানতে চাই—আকাশে তো কত লক্ষ-কোটি নক্ষত্র ছিল—যীশুর জন্মমুহূর্তে জ্বলে ওঠার জন্য অন্য কোনো নক্ষত্রকে কি বেছে নিতে পারতে না?

বেথলেহেমের আকাশে নতুন তারা'র জন্ম দিতে গিয়ে একটা সুন্দর গ্রহের সমস্ত অধিবাসীকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়াটা কি সত্যিই খুব জরুরি ছিল—ঈশ্বর?

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ঈশ্বরের নাম

আর্থার সি ক্লার্ক

'সত্যি বলতে, এমন অদ্ভুত প্রস্তাব আমাদের কাছে এর আগে কখনও আসেনি।' ভুরু কুঁচকে বলে উঠলেন ডক্টর ওয়েগনার। 'আপনাদের স্থানীয় এজেন্ট যখন তিব্বতের এক মন্যাস্ট্রির জন্য আমাদের কাছে অটোমেটিক সিকোয়েন্স কম্পিউটার বুক করে, আমরা রীতিমতো ঘাবড়ে গিয়েছিলাম, বলতে হয়। ইয়ে, যদি কিছু মনে না করেন—আপনাদের ধর্মীয় মঠে হঠাৎ এমন একটা আধুনিক যন্ত্রের দরকার পড়ল কেন?'

'না না, মনে করব কেন?' গেরুয়া সিল্কের আলখাল্লায় মোড়া শরীরটা নড়ে চড়ে ওঠে। ভাবলেশহীন মুখে সামান্য হাসির রেখা ফুটিয়ে তিব্বতি লামা বলেন, 'শুনেছি আপনাদের 'মার্ক ফাইভ' কম্পিউটারের সাহায্যে নাকি দশটি সংখ্যার যাবতীয় অঙ্ক কষে ফেলা যায়। আমাদের অবশ্য সংখ্যায় তেমন উৎসাহ নেই, অক্ষর নিয়েই আমাদের যা কিছু কাজকর্ম। সেজন্যই আপনার যন্ত্রের কিছু পরিবর্তন দরকার যাতে ওটার সাহায্যেই অক্ষর নিয়ে কাজ করতে পারি—'

'কিছুই তো বুঝতে পারছি না।' হতাশ ভঙ্গিতে লামা-র দিকে তাকান ডক্টর ওয়েগনার।

'এটা আমাদের একটা বিশেষ প্রজেক্ট যা নিয়ে আমরা গত তিনশো বছর ধরে কাজ করছি—মানে আমাদের মঠ প্রতিষ্ঠার সময়েই কাজটা শুরু হয়েছিল, আর কী! পুরো বিষয়টা আপনার কাছে অবাস্তব ঠেকতে পারে, কিন্তু আমার অনুরোধ, দয়া করে আমার কথা পুরোটা শুনবেন।'

'অবশ্যই।'

'যে কাজটার কথা বললাম, সেটা অবশ্য তেমন জটিল কিছু নয়। গত তিনশো বছর ধরে ঈশ্বরের নামের একটা তালিকা বানাচ্ছি আমরা—'

'অ্যাঁ?'

'না, মানে ঈশ্বরকে তো নানা নামে পৃথিবীর মানুষ ডাকে। কেউ বলে ভগবান,

BanglaBook.org

কেউ বলে বুদ্ধ, কেউ বলে আল্লা, কেউ বলে জিয়োভা—আমাদের তিব্বতি ভাষাতেও ভগবানের অসংখ্য নাম।'

'আর সেই নাম আপনারা লিখে চলেছেন গত তিনটে শতাব্দী ধরে?' ডক্টর ওয়েগনারের চোখে মুখে বিস্ময় আর ধরে না।

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।' নির্বিকারভাবে জবাব দেন লামা। 'আমাদের হিসেবে কাজটা শেষ করতে আরও পনের হাজার বছর লাগবে। বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই—এটা আমাদের কত বড় পবিত্র দায়িত্ব?'

'বুঝলাম।' মাথা নেড়ে সায় দেন ওয়েগনার। 'শুধু একটা কথা—হাজার হাজার বছর ধরে লেখার মতো এত অসংখ্য নাম পাচ্ছেন কোত্থেকে?'

'এটা বোঝা খুব কঠিন নয়। আপনাদের বর্ণমালার তুলনায় আমাদের বর্ণমালায় অক্ষরের সংখ্যা ঢের বেশি। আমাদের ধর্মীয় নির্দেশ হল—ভগবানের নামের মোট অক্ষর সংখ্যা নয়-এর বেশি হবে না। আমাদের বর্ণমালার যে কোনো ন'টি বা তার কম অক্ষরকে পরপর সাজিয়ে গেলেই আকাঙ্ক্ষিত নামগুলো পাওয়া সম্ভব—অঙ্কের পারমুটেশন—কম্বিনেশনের ব্যাপার আর কী! অবশ্য নামের অক্ষরগুলিকে সাজানোর সময় কতকগুলি শর্ত মানতে হয়; যেমন; একই অক্ষর পরপর তিনবারের বেশি আসবে না—'

'আপনি বোধহয় বলতে চাইছেন, একই অক্ষর পরপর দু'বারের বেশি আসবে না।' লামাকে বাধা দিয়ে বলে ওঠেন ওয়েগনার।

'আমাদের ভাষায় কোনো কোনো শব্দে একই অক্ষর পরপর চারবারও এসে থাকে—মানে, আমাদের বর্ণমালা একদম অন্যরকম কিনা।' লামা বোঝাতে চেষ্টা করেন। 'যা বলছিলাম, অক্ষরগুলোকে একের পর এক সাজিয়ে ভগবানের যাবতীয় নাম তালিকভুক্ত করতে যেখানে পনের হাজার বছর লাগার কথা—আপনাদের অটোমেটিক সিকোয়েন্স কম্পিউটার হয়তো সেটাই একশো দিনের মধ্যে করে ফেলবে—মানে, যদি কম্পিউটারকে সেইভাবে প্রোগ্রাম করে দেওয়া যায়—'

লামার এখানে আসার উদ্দেশ্যটা এতক্ষণে বোধগম্য হয় ডক্টর ওয়েগনারের। আশ্বাস দেওয়ার ভঙ্গিতে উনি বলেন, 'হ্যাঁ, আমাদের মার্ক-ফাইভ কম্পিউটারকে আপনাদের ওই বিশেষ কাজের উপযোগী করে তোলা সম্ভব। তবে কিনা, ওটাকে এখান থেকে তিব্বতে নিয়ে যাওয়ার সমস্যা রয়েছে—'

'ওটা কোনো সমস্যাই নয়।' ওয়েগনারকে বাধা দিয়ে বলে ওঠেন লামা। 'কম্পিউটারটি যদি আপনা ভারতে পৌঁছে দিতে পারেন তাহলে বাকি পথটুকু

BanglaBook.org

নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা আমরাই করব। অবশ্য দু'জন ইঞ্জিনিয়ারকে সঙ্গে দিতে হবে—আমাদের মঠে পৌঁছে যন্ত্রাংশগুলিকে অ্যাসেম্বল করার কাজ আছে, তাছাড়া পুরো কাজটা সম্পন্ন হতে যে মাস তিন-চার লাগবে, সে সময়টায় ওই মঠেই থাকতে হবে ওঁদের। বুঝতেই পারছেন, কম্পিউটার যদি হঠাৎ বিকল হয়, আমাদের পুরো পরিকল্পনাটাই ভেস্তে যাবে—'

'তা তো বটেই, তা তো বটেই।' লামার কথায় সায় দেন ডক্টর। 'কম্পিউটারের সঙ্গে দু'জন ইঞ্জিনিয়ার পাঠাতে আমাদের অসুবিধে হবে না। শুধু আর দুটো প্রশ্ন করব আপনাকে। আমাদের এই কম্পিউটারের দাম এবং ইঞ্জিনিয়ারদের পারিশ্রমিক সম্পর্কে আপনার এজেন্ট কি কোনো আভাস দিয়েছে?'

ডক্টর ওয়েগনারের প্রশ্নের জবাবে আলখাল্লার ভেতর থেকে একটা খাম বের করে আনেন লামা। খামটা ওয়েগনারের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলেন, 'এখানকার এশিয়াটিক ব্যাঙ্কে আমাদের কী পরিমাণ অর্থ জমা রয়েছে তার সার্টিফিকেট এটা। আপনাদের যন্ত্রপাতি এরোপ্লেনে ওঠার আগেই আমাদের এজেন্ট আপনাদের সমস্ত প্রাপ্য মিটিয়ে দেবে।'

সার্টিফিকেটের ওপর নজর বুলিয়ে ডক্টর বলেন, 'বেশ। বেশ। আর একটা প্রশ্ন—আপনাদের মঠে বিদ্যুতের ব্যবস্থা আছে?'

'হ্যাঁ, আছে। একটা ডিজেল জেনারেটর পঞ্চাশ কিলোওয়াট বিদ্যুতের জোগান দিতে সক্ষম। জেনারেটরটা আমরা কিনেছি বছর পাঁচেক আগে এবং এখনও পর্যন্ত সেটা বিকল হয়নি। আসলে ওটা কেনা হয়েছিল আমাদের ধর্মচক্রগুলিকে মোটরের সাহায্যে অবিরাম ঘোরানোর জন্য।'

'ওহ্, তাহলে তো কোনো সমস্যাই নেই।' জোড়হাতে উঠে দাঁড়ান ডক্টর ওয়েগনার।

তিব্বতী মঠটার চারপাশের দৃশ্য মোটেই তেমন আকর্ষণীয় নয়, অন্তত এই তিনমাস ধরে ক্রমাগত সামনে পেছনের উঁচু-নিচু পাথুরে জমি আর বহুদূরের উপত্যকার আবছা চেহারাটা দেখতে দেখতে জর্জ আর চাক-এর চোখ পচে গেছে। দূরের উঁচু উঁচু পাহাড়গুলোর কাছে যেতে পারলে মন্দ হত না। কিন্তু কম্পিউটার চালু হওয়ার পর এই মঠ ছেড়ে যাওয়ার উপায় নেই ওদের।

ভগবানের নাম লেখানোর কাজে যে কম্পিউটারকে লাগানো হবে, আর সেই

BanglaBook.org

কাজের তদারকিতে আসতে হবে ওদের—কখনও কল্পনাই করেনি ওরা। শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ যখন ওদের মনোনীত করল এবং পারিশ্রমিকের মোটা অঙ্কটাও জানিয়ে দিল—ওদের কেউই তখন এখানে আসতে আর অনীহা দেখায়নি। ওরা দু'জনে মিলে এখানকার এই উদ্ভট কাণ্ডের নাম রেখেছে—'প্রজেক্ট সাংগ্রিলা'। ওদের প্রতি মঠের সাধুদের আচরণও খুব ভালো। এই তিনমাসে ওদের কম্পিউটারও সুন্দরভাবে কাজ করেছে। ভগবানের নামের তালিকা সম্পূর্ণ হতে বেশিদিন আর লাগার কথা নয়।

জর্জ মাঝে মাঝে চাক্-কে খেপায়। বলে, 'ধরো, এখানকার লামা'রা হঠাৎ ঠিক করল—নয় অক্ষরের বদলে বিশ কিংবা তিরিশ অক্ষর দিয়ে ভগবানের নাম লিখবে। কী অবস্থাটা দাঁড়াবে ভাবো তো! পুরো কাজটা তখন আগামী দশ দিনে শেষ না হয়ে আরও হয়তো তিরিশ বছর লেগে যাবে। হয়তো ওরা বলবে, এ-কাজ শেষ না হলে আমাদের ফিরে যেতে দেওয়া হবে না।' বলেই হোঃ হোঃ করে হেসে ওঠে জর্জ।

'হাসিস না। এরা সব পারে।' বিরক্ত গলায় বলে ওঠে চাক্। 'এখানকার লামাদের মুখগুলো নিষ্পাপ দেখালে কী হবে, ভেতরে ভেতরে কী সব প্যাঁচ কষছে, কে জানে! আমার বাপু আর একদণ্ডও এখানে থাকতে ইচ্ছে করছে না। উহ্, কতদিন যে সভ্য মানুষ দেখিনি—'

'তুই কি এদের 'অসভ্য' বলতে চাস?' হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করে জর্জ।

'অসভ্য না হোক, অপ্রকৃতিস্থ তো বটেই। কাজ নেই কম্মো নেই, বসে বসে কম্পিউটারের টাইপ করা কাগজগুলোকে জাবদা খাতায় সেঁটে চলেছে!'

দিনকয়েক পরের ঘটনা। জর্জের কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে চাক্ বলল, 'এদের ব্যাপারস্যাপার মোটেই সুবিধের ঠেকছে না রে।'

'হঠাৎ কী হল?'

'এক্ষুনি জানতে পারলাম—এদের এসব পাগলামির উদ্দেশ্যটা কী?' উত্তেজনায় অস্থির দেখায় চাক্-কে। 'কম্পিউটারের টাইপ করা কাগজগুলো কেটে নিয়ে যায় যে ছোকরা সাধুটা, আজ হঠাৎ আমায় জিজ্ঞাসা করলে, কাজটা শেষ হতে আর কদ্দিন লাগবে? যেই বললাম, 'আশা করছি আর দিন তিনেকের মধ্যেই ঈশ্বরের শতকোটি নাম লেখার কাজটা শেষ হয়ে যাবে'—অমনি লোকটা বললে, 'আমাদের শাস্ত্র বলে—ভগবান নাকি তাঁর নাম শেখানোর উদ্দেশ্যেই মানুষ সৃষ্টি

BanglaBook.org

করেছেন! তাঁর নাম লেখার কাজটা শেষ হয়ে গেলেই এ বিশ্বজগতের অস্তিত্বের কোনো প্রয়োজন থাকবে না'

'অর্থাৎ, কম্পিউটারের কাগজে শেষ নামটা ছাপা হওয়ার পর যেই সেটা ওদের জাবদা খাতায় সাঁটা হবে, অমনি গোটা দুনিয়াটাও ধ্বংস হয়ে যাবে—এই তো?' ঝাঁঝালো গলায় বলে ওঠে জর্জ। 'এসব কথা তুই বিশ্বাস করিস? এদের সঙ্গে তুইও কি পাগল হলি?'

'দূর, ওদের কথা কে বিশ্বাস করছে? আমি ভাবছি—কম্পিউটারের কাজটা শেষ হওয়ার পরেও যখন দুনিয়ার কোনো পরিবর্তন হবে না, ওদের মধ্যে তার প্রতিক্রিয়াটা কেমন হবে? ওরা হয়তো ভাববে, কম্পিউটারের কাজকর্মে নিশ্চয়ই কোনো ভুল ছিল। রাগে-হতাশায় ওরা যদি কম্পিউটারটাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলে? যদি আমাদেরই দোষী ঠাওরায়, তখন?'

'এটা সত্যিই ভাবনার কথা,' জর্জকে চিন্তিত দেখায়, 'তবে কিনা এসব ভবিষ্যৎবাণী-টানী না মিললেও লোকের তেমন কিছু এসে যায় না। আমাদের ওখানে জানিস এক জ্যোতিষী একবার ভবিষ্যৎবাণী করেছিল—অমুক রবিবার সূর্যের গ্রহগুলো সব অদ্ভুত অবস্থানে আসছে, ফলে ওইদিন পৃথিবীর ধ্বংস অনিবার্য! অনেকে লোকটার কথা বিশ্বাস করেছিল। জলের দরে নিজেদের ঘরবাড়ি সব বেচেও দিয়েছিল কেউ কেউ। তারপর সেই নির্দিষ্ট রোববারে যখন কিছুই ঘটল না—জ্যোতিষীর ওপর কেউ কিন্তু তেমন রাগটাগ দেখাল না। সবাই ধরে নিল, লোকটার হিসেবে নিশ্চয়ই গলদ ছিল।'

'তোমার সেই পুরনো শহরের সঙ্গে তিব্বতের এই দুর্গম অঞ্চলের যে কোনো মিলই নেই, তা কি তোমায় মনে করিয়ে দিতে হবে?' গম্ভীর গলায় বলে ওঠে চাক্। 'এই মঠে যে কয়েকশো সন্ন্যাসী আছে তাদের মুখের দিকে ভালোভাবে তাকালে দেখবি—কী গভীর প্রত্যয় সেখানে! ওদের পূর্বতন লামা-রা ভুল কথা বলে গেছেন, এটা ওরা কখনই বিশ্বাস করবে না।'

'তুই এ অবস্থায় কী করতে বলিস?' জর্জকে এবারে সত্যি সত্যিই উৎকণ্ঠিত দেখায়।

'আমাদের নিতে প্লেন আসবে আজ থেকে ঠিক সাতদিন পরে। অথচ হিসেব মতো, কম্পিউটারের কাজ শেষ হতে আর দিন তিনেক সময় লাগার কথা। সেক্ষেত্রে কম্পিউটারকে কয়েক দিনের জন্য অকেজো করে রাখা ছাড়া গতি নেই। এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে ঈশ্বরের শেষ নামটা কাগজের ওপর টাইপ হওয়ার আগেই আমাদের প্লেনটা মাটি ছেড়ে আকাশে উঠে পড়ে।'

BanglaBook.org

'কাজ শেষ না করে চলে যাওয়াটা কি ঠিক হবে?' জর্জের মনটা খুঁত-খুঁত করে। ব্যাপারটা মোটেই ভালো লাগছে না আমার।'

'এ ছাড়া কোনো উপায় নেই যে।' বন্ধুকে বোঝাতে চেষ্টা করে চাক্, 'সভ্যজগৎ থেকে এতদূরে বসে কি কোনোরকম রিস্ক্ নেওয়া যায়?'

প্রায় ঘণ্টা দুয়েক হল, মন্যাস্ট্রি থেকে পাহাড়ি টাট্টুতে চেপে বেরিয়ে পড়েছে জর্জ আর চাক্। প্রায় চোরের মতো সকলের অজান্তেই বেরিয়ে আসতে হয়েছে ওদের। কম্পিউটারের কাজ আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে—এটা জানার পর মঠের প্রায় সমস্ত সাধুই ধ্যানস্থ হয়ে বসে পড়েছিল বুদ্ধের বিশাল মূর্তির সামনে, সেই সুযোগটাকেই কাজে লাগিয়ে মঠ ছেড়ে চলে এসেছে ওরা দু'জনে।

পাহাড়ের নিচে ছোট্ট একটু সমতল জায়গা। টাট্টুকে দাঁড় করিয়ে ওপরে তাকাল জর্জ। অনেক উঁচুতে সাদা বিন্দুর মতো দেখা যাচ্ছে বৌদ্ধ মঠটাকে। কবজি উল্টে ঘড়ি দেখল জর্জ। আর মাত্র ঘণ্টাখানেক পরেই ঈশ্বরের নামকরণের কাজটা শেষ হবে। সেই মুহূর্তে লামা-দের মনের অবস্থা কী হবে? ওইসব শান্ত-সংযত সন্ন্যাসীরা কি রাগে-হতাশায় গুঁড়িয়ে দেবে অত দামি 'মার্ক-ফাইভ' কম্পিউটারকে? নাকি ওরা অবিচলিতভাবে ভগবানের নাম লেখার কাজটা নিজেদের হাতেই আবার শুরু করবে নতুন করে?

'দ্যাখ্, দ্যাখ্—প্লেনটাকে কী সুন্দর দেখাচ্ছে, ঠিক যেন একটা ছোট্ট পাখি—ডানা মেলে ওড়ার জন্য তৈরি—'

চাক্-এর কথায় চমক ভাঙে জর্জের। দূরে রানওয়ের ওপর ডি-সি প্লেনটাকে ঠিক একটা রুপোর ক্রস-এর মতো দেখাচ্ছে। একটু পরেই ওটা ওদের দুজনকে এই উদ্ভট রাজ্য থেকে নিয়ে যাবে সেই দেশে যেখানে ঈশ্বরের নাম নিয়ে লোকের কোনো মাথাব্যথা নেই।

টাট্টু-দু'টো ধীরপায়ে পাহাড়ের গা বেয়ে নামতে থাকে। সূর্যের আবছা আলো পুরোপুরি মুছে যাওয়ার আগেই আকাশে দু'টো-একটা করে তারা উঁকি দিতে শুরু করেছে। একেবারে ঝকঝকে পরিষ্কার আকাশ, পাইলটের কোনো অসুবিধে হবে না প্লেনটাকে আকাশে ভাসিয়ে নিতে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে জর্জ।

'প্লেনটার কাছে পৌঁছতে বড় জোর আর মিনিট কুড়ি-পঁচিশ লাগবে, কী বলিস! বন্ধুর দিকে তাকিয়ে খুশি-খুশি গলায় বলে ওঠে জর্জ, 'ভাবছি, এতক্ষণে নিশ্চয়ই কম্পিউটারের কাজটা শেষ হয়েছে—'

BanglaBook.org

চাক্ নিরুত্তর। জর্জ দেখে, ফ্যাকাশে মুখে কী যেন এক অপার্থিব দৃশ্য দেখবে বলে আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে চাক্।

'অ্যাই, এদিকে দ্যাখ,' ফিসফিস করে বলে ওঠে চাক্। 'আকাশের তারাগুলো একটা দু'টো করে মিলিয়ে যাচ্ছে—তাই না?'

বন্ধুর কথাটা যাচাই করতেই যেন আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকায় জর্জ।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

জঞ্জাল

ভলাদিমির গ্রিগরিয়েভ

মস্কোর পুরনো এক গলির মোড়ে ময়লা ফেলার ডাস্টবিনের পাশে জরাজীর্ণ কাঠের ফলকটা কারো কারো চোখে পড়ে থাকবে। ফলকটার গায়ে আবছা হয়ে আসা একটা ছবি—তাতে গ্রামোফোনের চোঙের-মতো দেখতে এক প্রকাণ্ড শিঙার সরু মুখে বেল্‌চা দিয়ে আবর্জনা ঢোকাচ্ছে একজন ছোট্ট-খাট্টো মানুষ, আর শিঙার অন্যমুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে টুকিটাকি নানা কাজের জিনিস। গরম পোশাক, পাউরুটি-বিস্কুট, ছুরির ফলা, দুধ-ভর্তি বোতল—মায় আস্ত একটা হারমোনিয়ামও নজরে আসে। পাড়ার লোকজন যাতে বাড়ির আবর্জনা এনে ওই ডাস্টবিনের মধ্যে ফেলে তা বোঝাতে ওই ছবির পাশে গোট গোটা অক্ষরে লেখা—

'এইখানে সব্বাই,

জঞ্জাল আনো ভাই!'

ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে পথ চলতে চলতে মায়েরা ওই ছবির তামাটে রঙের চোঙ দেখিয়ে বলত, 'ম্যাজিক-চোঙটা দেখে নাও; যা চাইবে তাই পাবে ওর কাছে......।' বাচ্চারাও অমনি খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠত।

তা, এসব অবশ্য পুরনো দিনের কথা। দুচারটে শীত কাটতে না কাটতেই শিঙার রং বিবর্ণ হয়ে গেছে। বেঁটে-খাটো যে লোকটা বেল্‌চা হাতে দাঁড়িয়ে থাকত শিঙাটার সরু প্রান্তে, তার চোখ-মুখ আর আলাদা করে বোঝা যায় না, বেল্‌চাটাও উধাও! কাঠের ফলকের অবস্থাও রীতিমতো নড়বড়ে। পথচলতি লোকেরা এখন আর ফিরেও তাকায় না ছবিটার দিকে। বলতে গেলে, গলির মুখে পুলিশ-চৌকির ওপর থেকে পেত্রোভ-এরই যা একটু নজর পড়ে ওটার দিকে। এক জায়গায় টানা পনের বছর ধরে ট্র্যাফিক-পুলিশের ডিউটি করছে পেত্রোভ। চোখ বুজলেও, এ জায়গার প্রতিটা ইট-কাঠের চেহারা যেন ওর চোখের সামনে ভাসে—

ব্যতিক্রম ঘটল একদিন। শীতের এক সন্ধেয় গলির মোড় থেকে পেত্রোভ দেখল—হাঁটু অবধি ঢাকা পশমের কোট গায়ে, মাঝবয়েসি, খ্যাপাটে চেহারার

BanglaBook.org

বেঁটে-খাটো একটা লোক এসে দাঁড়িয়েছে ছবিটার সামনে; কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে নিবিষ্ট মনে কী যে দেখে চলেছে, কে জানে!

লোকটার নাম স্তেপান অগ্রৎসভ। হাবভাবে একটু খ্যাপাটে হলেও পাড়ার লোকে এক ডাকে চেনে ওকে। না চিনেই বা উপায় কী? যে কোনো জিনিস মেরামতির কাজে লোকটার অসাধারণ দক্ষতা। ঘড়ি, রেডিও, টর্চ, তালা কিংবা সেলাইকল অকেজো হলেই স্তেপানের খোঁজ পড়ে। এমনকী এক প্রতিবেশীর পুরনো ঝরঝরে টেলিভিশন সেট-টা এমনভাবে সারিয়ে দিয়েছে যে পাড়ার লোকেরা এখন তাতে সিনেমা দেখতে ভিড় করে! স্তেপানের হাতে একবার যে জিনিস পড়েছে, সারাই-এর পর তা যে বহুদিন আর বিগড়বে না সে ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকে সবাই।

বাড়িওয়ালার ছোট্ট মেয়েটাকে একবার একটা মজার পুতুল বানিয়ে দিয়েছিল স্তেপান। পুতুলটা যে শুধু হাত দুলিয়ে দুলিয়ে হাঁটত আর মুখ দিয়ে শব্দ করত তাই নয়, রাত ঠিক আটটায় চোখ বুজে দড়াম করে শুয়ে পড়ত, আবার চোখ খুলত ঠিক বারো ঘণ্টা পরে। বন্ধুবান্ধবদের পুতুলটা দেখিয়ে খুশি খুশি মুখে বাড়িওয়ালা বলত, 'আমাদের আর এখন অ্যালার্ম ঘড়ির দরকার হয় না—'

ট্রাফিক-পুলিশ পেত্রোভের অবশ্য এসব কিছুই জানা ছিল না, আর তাই স্তেপানকে হঠাৎ ডাস্টবিনের সামনে নিবিষ্টমনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ওর মনে সন্দেহ জাগাটাই স্বাভাবিক। অমন করে কী দেখছে লোকটা? কী এমন আহামরি চিত্র যে তার দিকে তাকিয়ে একেবারে আত্মভোলা হয়ে যেতে হবে! মতলব কী লোকটার?

পরের দিন আবার এল স্তেপান। বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ছবিটার সামনে। পেত্রোভও লক্ষ করল, লোকটা নিজের মনে কী সব যেন বিড়বিড় করে বলছে আর একটা বাঁধানো খাতায় আঁকিবুঁকি কাটছে! এদিকে পেত্রোভ পড়েছে মহাফাঁপরে। লোকটার আচরণ এমন কিছু অসঙ্গত নয় যে তাকে নিয়ে পুলিশি জেরা করে, এদিকে আবার কৌতূহল চাপতে না পেরে প্রাণ আইঢাই!

তা দিনকয়েকের মধ্যে পেত্রোভ কেন, আশপাশের লোকজনের কারোরই জানতে বাকি রইল না যে, মস্কোর সেরা মেকানিক স্তেপানের মাথায় ওই ছবির মতো সত্যিকারের এক শিঙা বানানোর খেয়াল চেপেছে। জিনিসপত্র মেরামতের কাজে স্তেপানকে আর পাওয়া যায় না। সকাল-বিকেল নিয়ম করে ও এখন

BanglaBook.org

ছবিটার সামনে গিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছবিটা দেখে আর তারপর বাড়ি ফিরে, ওই ছবিরই নক্সামতো শিঙার মতো দেখতে পেল্লায় এক যন্ত্র বানাতে থাকে; প্রতিবেশীরা পরস্পরকে বলে, 'ওহে শুনেছ, আমাদের স্তেপান আবার আবিষ্কারের নেশায় মেতেছে!'

এক একদিন মনের স্ফূর্তিতে শিস্ দিতে দিতে বা গুন্ গুন করে গান গাইতে গাইতে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায় স্তেপান। পেত্রোভ কান খাড়া করে গানের লাইনগুলো শোনার চেষ্টা করেছে। উদ্ভট সব কথা—'বিদ্যুৎ-বর্তনী/চুম্বক/চোঙের গায়ে তামার প্রলেপ/চমৎকার! চমৎকার!...' আবার এক একদিন একেবারে উল্টো দৃশ্য। লোকটা এসে বিমর্ষমুখে দাঁড়িয়ে থাকে ছবিটার সামনে। মাথাটা ঝুঁকে থাকে। একেবারে হতাশায় ভেঙে পড়া একটা মূর্তি!

কিন্তু না, ভেঙে পড়ার লোক নয় স্তেপান। কোনো কাজ শুরু করে তার শেষটা না দেখে ছাড়ার লোক নয় সে। সমস্ত কাজ কারবার মাথায় উঠেছে, ছবিতে আঁকা যন্ত্রটাই এখন ওর ধ্যান-জ্ঞান! টুক্‌টাক্ মেরামতির কাজ নিয়ে পড়শিদের আসা-যাওয়া বন্ধ। বাড়িতে সর্বক্ষণ এক পেল্লায় চোঙ নিয়ে মেতে আছে স্তেপান। কতবার যে সেই চোঙের চেহারা বদলেছে, আর চোঙের গায়ে লাগানো হয়েছে কত বিচিত্র সব বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি! ফাঁকে ফাঁকে চলছে অঙ্ক কষা আর ছবির নক্সার খসড়া। স্তেপানের দৃঢ় বিশ্বাস—অঙ্কের ভুলচুকগুলো শুধরে নিলে আর শিঙার নক্সাটা ঠিকঠাক হলে ডাস্টবিনের ধারে কাঠের ফলকের গায়ে আঁকা সেই ছবিটাই বাস্তবরূপ নেবে। ছবিটা যে নেহাতই এক অনামী চিত্রকরের উদ্ভট কল্পনার স্বাক্ষর নয় তা প্রমাণ করবে সে।

স্বপ্ন সাধারণত সফল হয় না, কিন্তু স্তেপানের বরাতে সেই বিরল ঘটনাই ঘটল। একদিন চোঙের ভেতরকার তড়িৎবর্তনী আর চুম্বকের কার্যকারিতা যাচাইয়ের উদ্দ্যেশ্যে সুইচগুলিকে নাড়ানাড়ি করতে গিয়েই অঘটন ঘটল, বলা যায়। শিঙাটার চকচকে গা দিয়ে প্রথমে আগুনের ফুলকি ছিটকে বেরুল আর তারপরই সাতরঙা আলোয় ভরে গেল গোটা ঘরটা! খানিকপরে স্তেপান অবাক হয়ে দেখল, শিঙার একদিকের মুখ দিয়ে আবর্জনা আর ভাঙাচোরা জিনিসপত্র ঢুকিয়ে দিলে অন্য মুখ দিয়ে সেসব বেরিয়ে আসছে ঝকঝকে নতুন চেহারা নিয়ে! একবার না, দুবার নয়, বারবার। সুতরাং স্তেপানকে নতুন ভাঁজ-ভাঙা কোট-প্যান্ট পরতে হল। জুতোয় কালি লাগিয়ে আর দাড়ি কামিয়ে হাজির হতে হল পেটেন্ট অফিসে।

Banglabook.org

স্তেপানের ধারণা ছিল, সরকারি অফিসাররা বিশেষ কাজের হয় না। তার সেই ধারণাটা পাল্টে গেল মলোকটভকে দেখে। ছোকরা অফিসার—অফিসে কাজ করছিল রাশভারী ভঙ্গিতে।

'একটা আবিষ্কারের বিষয় জানাতে এসেছিলাম।' আমতা আমতা করে বলে উঠেছিল স্তেপান।

মলোকটভ কিন্তু যথেষ্ট উৎসাহ নিয়ে স্তেপানের যন্ত্রটা সম্পর্কে খুঁটিনাটি জেনে নিল। তারপর টেলিফোনে সেক্রেটারিকে ডেকে সেদিনের সব মিটিংগুলো ঘণ্টাকয়েক পিছিয়ে দিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে সটান চলে এলো স্তেপানের ডেরায়। পাকা মিস্ত্রির মতো যন্ত্রটা দেখতে লাগল মলোকটভ, সেই সঙ্গে প্রশ্নের পর প্রশ্ন ঃ 'তড়িৎ-বর্তনীকে ঠিকমতো আর্‌থ্ করা হয়েছে তো?' 'চুম্বকের সঙ্গে তারটা ওইভাবে জোড়া হয়েছে কেন?' 'যন্ত্রের কার্যকারিতা কত?' ইত্যাদি, ইত্যাদি। পাশে দাঁড়িয়ে জবাব দিতে দিতে স্তেপানের হঠাৎ মনে হল—এরপর হয়তো মলোকটভ মেশিনটা চালিয়ে দেখাতে বলবে। অথচ, এখন এমনই অবস্থা—ঘরে শুধু নতুন জিনিসের রাশি, একটুকরো আবর্জনা কোথাও পড়ে নেই!

'হাতের কাছে আবর্জনা না থাকলেও আবর্জনা পেতে কতক্ষণ? শিঙার মুখ দিয়ে যেসব কাজের জিনিস এসেছে সেগুলিকেই আবার ওর পেটের মধ্যে চালান করে যন্ত্রের হাতলটা উল্টোদিকে ঘোরালেই হল......।' কথাটা ভাবতেই হাসি পেল স্তেপানের। আরে, আস্ত জিনিস ভেঙে নষ্ট করতে কি আর যন্ত্রের প্রয়োজন হয়?

স্তেপানের সম্বিত ফিরল মলোকটভের ডাকে।

'আমার অভিনন্দন নিন মিস্টার অগ্রুৎসভ। আপনার এই আবিষ্কার নিঃসন্দেহে এক যুগান্তকারী ঘটনা। আমি ব্যবস্থা করছি যাতে আপনি জনসাধারণের সামনে এই যন্ত্রটার অবিশ্বাস্য ক্ষমতা হাতে কলমে প্রমাণ করতে পারেন। আবর্জনার জন্য চিন্তা নেই। মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনকে বলে এক গাড়ি আবর্জনার ব্যবস্থা রাখব সেদিন।'

মলোকটভ বিদায় নিতেই দরজায় হুড়কো টেনে বাইরে বেরিয়ে এল স্তেপান। মনে মনে ভাবল, আজ অন্তত একবার ডাস্টবিনের ধারে ওই ফলকটার কাছে যাওয়া উচিত। ওটা চোখে না পড়লে যন্ত্র বানানোর আইডিয়াটাই হয়তো কোনোদিন আসত না মাথায়।

গলির মুখটায় ফলকটার কাছে এসে এই প্রথম চারদিকে চোখ বোলাল

BanglaBook.org

স্তেপান। রাস্তায় লোকজন প্রায় নেই বললেই চলে। গুটি গুটি পায়ে স্তেপান এসে দাঁড়াল প্রহারারত পেত্রোভের সামনে।

'আসুন সার্জেন্ট, একটা সিগারেট খাওয়া যাক। জানেন, আজ আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের দিন। ওই যে ফলকটা দেখছেন—ওইরকম একটা শিঙা তৈরি করেছি আমি। সেটা কিন্তু সত্যি সত্যিই আবর্জনা থেকে নানারকম দরকারি জিনিস তৈরি করতে পারে।'

'প্রথম দিনই আপনাকে দেখে বিজ্ঞানী বলে মনে হয়েছিল।' সমঝদারের ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়লেন পেত্রোভ। 'বিজ্ঞানীদের মাথা থেকে কতসব আজব জিনিসই না বেরয়! তা, কাজ যখন শেষ হয়ে গেছে, তখন কি এদিকে আর আসবেন?'

স্তেপান বলে 'আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে খুব ভালো লাগল। হয়তো আমাদের আর কোনোদিন দেখা হবে না, তবু আমার আনন্দের প্রথম ভাগীদার হলেন আপনি। আচ্ছা চলি তাহলে—'

পেত্রোভ কিংবা স্তেপান, কেউই ভাবতে পারেনি, তাদের দুজনের আবার দেখা হবে খুব তাড়াতাড়ি—এক অবিশ্বাস্য পরিস্থিতিতে!

দিনটা ছিল শরতের এক দুপুর। বৃষ্টিধোয়া নীল আকাশের নিচে, শহরের ঠিক বাইরে এক খোলা মাঠে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। খবরটাও চাপা থাকেনি। কারিগর অগ্রুৎসভ নাকি এমন এক যন্ত্র বানিয়েছে যা ভাঙাচোরা আবর্জনা থেকে নতুন করে সব কাজের জিনিস তৈরি করে! সেই আজব যন্ত্রের কেরামতি দেখতে সকাল থেকেই শয়ে শয়ে লোক এসে ভিড় জমিয়েছে মাঠটাকে ঘিরে।

নিজের চোখে না দেখলে স্তেপানও বোধহয় বিশ্বাস করত না—তার আবিষ্কারকে এতটা গুরুত্ব দেবেন পেটেন্ট বিভাগের কর্তারা। মাঠের মাঝখানে সাজানো-গোছানো মঞ্চ, তার ওপরে বসানো হয়েছে তার এতদিনের সাধনার ফসল, সেই অত্যাশ্চর্য যন্ত্রটা; মঞ্চের পাশেই একগাড়ি জঞ্জাল। নাহ্, আয়োজনের কোনো খুঁত নেই।

হঠাৎ স্তেপানের চোখ পড়ে সার্জেন্ট পেত্রোভের দিকে। 'আরে সার্জেন্ট, আপনি এখানে যে?'

'একেই বলে যোগাযোগ,' করমর্দনের উদ্দেশ্যে স্তেপানের দিকে হাত

BanglaBook.org

বাড়ায় পেত্রোভ, 'স্পেশাল ডিউটি পড়েছে আজ এখানে। এত লোকের ভিড়, বলা যায় না—গণ্ডগোল বাঁধতে কতক্ষণ? অবশ্য, আমি যখন আছি—'

ইতিমধ্যে কর্মকর্তাদের একজন এগিয়ে আসেন। বলেন, 'মিস্টার অগ্রুৎসভ, এবার তাহলে আপনার যন্ত্রের কার্যক্ষমতা যাচাই করা যাক্—কী বলেন?'

'কিন্তু, মাত্র একগাড়ি জঞ্জালে কী হবে?' মঞ্চের দিকে এগোতে এগোতে বলে ওঠে স্তেপান।

'বলেন কী? আরও জঞ্জাল চাই?'

'অবশ্যই।'

'কতটা দরকার?'

'অন্তত দশগাড়ি তো বটেই।' উত্তর দেয় স্তেপান। 'আসলে, ব্যাপারটা একবার শুরু হলে তো চলতেই থাকবে। বিশ, ত্রিশ, পঞ্চাশ—যত গাড়ি জঞ্জাল আপনার ইচ্ছে হয় ঢালুন না!'

'বেশ, আপনার যন্ত্রটা একবার চালু তো করুন, তারপর না হয় শহরের যাবতীয় জঞ্জাল এনে ফেলা যাবে এখানে।'

শুরুতে পেটেন্ট অফিসের সেই ছোকরা-অফিসার মলোকটভের সংক্ষিপ্ত ভাষণ। মঞ্চের ওপরে রাখা অদ্ভুত-দর্শন যন্ত্রটার ক্রিয়াকলাপ বর্ণনা করেই সে হাত বাড়িয়ে দিল স্তেপানের দিকে। আবেগ-জড়ানো গলায় বলে উঠল, 'এই যে মানুষটিকে দেখছেন, এঁর কারিগরি প্রতিভা আমাদের এমন এক যন্ত্র উপহার দিয়েছে যার দিকে আগামী শতকের মানুষও বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে থাকবে! আসুন মিস্টার অগ্রুৎসভ, এবারে আপনার যন্ত্রটা চালু করুন, এখানে জড়ো হওয়া লোকেদের কৌতূহল মেটান—'

দর্শকদের উদ্দাম করতালির মাঝে যন্ত্রের কাছে এগিয়ে গেল স্তেপান। প্রথমে শিঙার চারপাশের বৈদ্যুতিক কন্ট্যাক্টগুলি ঠিক জায়গায় আছে কিনা দেখে নিয়ে মুঠো করে খানিকটা আবর্জনা সরু মুখটা দিয়ে চালান করে দিল ভেতরে। তারপর শিঙার পেটের কাছে হাতলটা ঘোরাতেই একটু একটু করে জঞ্জাল ভেতরে ঢুকতে লাগল—যেন অদৃশ্য এক কন্‌ভেয়ার-বেল্ট যেন নিয়ে যেতে শুরু করল ওগুলোকে!

কয়েক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা। তারপরই শিঙার প্রকাণ্ড হাঁ-মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসতে শুরু করল টুকিটাকি সব কাজের জিনিস। সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের উল্লাসে চাপা পড়ে গেল যন্ত্রের আওয়াজ!

BanglaBook.org

'আরে! উলের একজোড়া মোজা যে!'

'দেখ, দেখ, জলের কেটলি! আরিব্বাস!'

জুতো, জামা, পেপারওয়েট, সিগারেট-প্যাকেট, দুধের বোতল, টিনের কৌটো, ছুরি-কাঁচি, ব্লেড, ব্যাটারি, গেলাস—মঞ্চের ওপর আনকোরা জিনিসের যেন ছোটখাটো পাহাড় জমতে থাকে! উপস্থিত জনতার উল্লাস আর বাধা মানে না। স্তেপানের চোখ দুটো খুশি আর কৃতজ্ঞতায় চকচক করে।

গোটা মাঠ যখন আনন্দে আর বিস্ময়ে উদ্বেল, একজন মানুষকে দেখা গেল পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চল-অবিচলিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকতে। হাঁটু অবধি লম্বা একটা ওভারকোট গায়ে মানুষটি স্তেপানের যন্ত্র দেখছিল গভীর মনোযোগ দিয়ে। ওর নাম 'পারভোজভ'। লোকে বলে, পৃথিবীর কোনো ঘটনাই পারভোজভ-কে কখনও বিস্মিত করতে পারেনি। সবকিছুই নিজের বিচারবুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করার এক অদ্ভুত ঝোঁক ওর। এর জন্য লোকটার খ্যাতি-অখ্যাতি দুটোই সমান।

'দয়া করে আপনারা একটু শান্ত হোন।' হঠাৎ সকলের গলা ছাপিয়ে ভেসে উঠল পারভোজভের গম্ভীর কণ্ঠ। 'এই আবিষ্কারটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ নিয়ে এত বেশি মাতামাতি করার আগে এই যন্ত্র সম্পর্কে কিছু খুঁটিনাটি তথ্য জেনে নেওয়া দরকার।'

'আরও খুঁটিনাটি? যন্ত্রটা যে নিখুঁতভাবে কাজ করছে সেটা তো সবাই আমরা দেখতে পাচ্ছি।' ভিড়ের মধ্যে থেকে চেঁচিয়ে ওঠে কেউ কেউ।

'শুধু কাজ করলেই হল?' মুখে একটা সবজান্তার হাসি ফুটিয়ে পারভোজভ এগিয়ে এলো স্তেপানের কাছে। 'আচ্ছা—মিস্টার অগ্রৎসভ, বলুন তো—আপনার এই শিঙা-যন্ত্র থেকে কোন কোন জিনিস বেরবে তা কি আগে থেকে জানা সম্ভব? তাছাড়া জিনিসগুলোর ফর্দ বানানোর একটা স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাও তো থাকা চাই।'

'না, মানে, এ ব্যাপারটা আমি ভাবিনি।' লজ্জিতভাবে বলে ওঠে স্তেপান। 'আসলে যন্ত্রটা বানাতেই এতগুলো দিন কেটে গেল। তবে আপনি এখন বলছেন—'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। এসব ব্যবস্থা তো রাখতেই হবে।' প্রায় উপদেশের ভঙ্গিতে বলে ওঠে পারভোজভ। 'আর একটা প্রশ্ন ঃ আপনার এই যন্ত্রটা যেমন জঞ্জালকে টুকিটাকি কাজের জিনিসে রূপান্তরিত করে, তেমনি এর উল্টোটাও কি সম্ভব? মানে, এই যে দরকারি জিনিস সব যন্ত্রের পেট থেকে বেরিয়ে এলো—এগুলিকে কি আবার আগের জঞ্জালের 'চেহারায় ফিরিয়ে দেওয়া যায়?'

BanglaBook.org

'অবশ্যই। কিন্তু এ প্রশ্ন উঠছে কেন? কেউ কি আর সাধ করে আনকোরা কাজের জিনিসকে জঞ্জালে রূপান্তরিত করতে চায়?'

'চাক বা না-চাক, আপনার যন্ত্রটা যে ওই কাজটা পারে তা একবার চাক্ষুষ দেখাতে অসুবিধে কোথায়?'

'লোকটা কি উন্মাদ?' মনে মনে ভাবে স্তেপান। কর্মকর্তাদের একজন এগিয়ে আসে। বলে, 'ইনি যখন চাইছেনই, তখন একবার নাহয় করেই দেখান।'

'বেশ।' স্তেপান উল্টোদিকে যন্ত্রের হাতল ঘোরায়। শিঙার প্রকাণ্ড মুখটা দিয়ে একটু আগেই যেসব কাজের জিনিস বেরিয়ে এসেছিল—এবার সেগুলিই গিয়ে ঢুকতে থাকে তার মধ্যে। ঝড় উঠলে যেমন হয়, হঠাৎ এক দমকা হাওয়া যেন জিনিসগুলিকে উড়িয়ে নিয়ে যায় শিঙার মুখের ভেতর!

পারভোজভ গিয়ে দাঁড়িয়েছিল মঞ্চের ওপরে, হঠাৎ ওর মাথার টুপিটা উড়ে যায় শিঙার দিকে। প্রথমটা হতভম্ব হলেও পরক্ষণেই পারভোজভ ঝাঁপিয়ে পড়ে টুপিটাকে বাঁচানোর জন্য।

'টুপির মায়া ছেড়ে সরে আসুন, সরে আসুন,' বলে চেঁচাতে থাকে স্তেপান।

কিন্তু কে কার কথা শোনে! স্তেপান দেখে—প্রচণ্ড ঘূর্ণির টানে লোকটার হাত-মুখ ঢুকে গেছে শিঙার মুখে! চিন্তাভাবনার অবকাশ নেই—স্তেপান লাফিয়ে গিয়ে চেপে ধরল পারভোজভের একটা পা। 'আপনারা কেউ দয়া করে হাতলটাকে চেপে ধরুন' — বলে মঞ্চের ওপর দাঁড়ানো লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে অসহায়ের মতো চিৎকার করতে থাকে স্তেপান। ওর কথা শেষ হতে না হতেই যান্ত্রিক আওয়াজে পারভোজভের শেষ আর্তনাদ ঢাকা পড়ে গেল, আর সেইসঙ্গে—

হ্যাঁ, সেইসঙ্গে হ্যাঁচকা টানে স্তেপানও ঢুকে গেল যন্ত্রটার ভেতর। তারপর নীল আলোর ঝলকানি; বিকট এক আর্তনাদ তুলে আপনা থেকেই থেমে গেল যন্ত্রটা।

সার্জেন্ট পেত্রোভ ছুটে এসেছিল সবার আগে। শিঙার ভেতরে মুখ ঢুকিয়ে কিছুই নজরে এল না ওর।

বিস্ময়ে হতবাক জনতার মধ্যে থেকেও অনেকে এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল যন্ত্রটাকে। তাদেরই কেউ একজন যন্ত্রের হাতলে চাপ দিল। নাহ্, দিব্যি ঘুরছে হাতলটা—দুদিকেই। কিন্তু যন্ত্রের কোনো সাড়াশব্দ নেই!

'আমরাই দায়ি এই পরিণতির জন্যে!' মলোকটভের গলা এতক্ষণে শোনা

BanglaBook.org

যায়। 'পারভোজভের মতো লোককে এসব জায়গার মাইলখানেকের মধ্যে আসতে দেওয়া উচিত হয়নি।'

'কিন্তু ওই স্তেপান অগ্রৎসভ লোকটাই বা কী? যন্ত্র বানাল, অথচ তাকে চালানোর কায়দা শিখিয়ে গেল না কাউকে!'

'সে সুযোগ আর ও পেল কোথায়? তার আগেই তো বেচারাকে—'

এখানেই ঘটনার ইতি। শহরের সেরা ইঞ্জিনিয়াররা বহুদিন ধরে যন্ত্রটার কল-কব্জাগুলোর কাজকর্ম বোঝার চেষ্টা করেছে। তাতে অবশ্য ফল কিছুই হয়নি। মলোকটভ ওটার নাম দিয়েছে—'আগামী শতকের যন্ত্র।' সার্জেন্ট পেত্রোভ এখনও ডিউটি করে গলির মুখে। শুধু ডাস্টবিনের ধারে ফলকটার গায়ে আবছা ছবিটার দিকে আর ভুলেও তাকায় না।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

মতামত

ফ্রেডরিক পল ও সি এম কর্নব্লাথ

হ্যারি ভ্লাদেক-এর বিরাট শরীরটার তুলনায় তার ভক্সওয়াগেন গাড়িটাকে নেহাত ছোটই বলতে হয়। হ্যারির অবশ্য কীই বা করার আছে? বেচারার আর্থিক অবস্থা এমন নয় যে হাল-মডেলের নতুন একটা গাড়ি কেনে। ছোট্ট ভক্সওয়াগেনের ব্রেক চাপলেই 'ক্যাচ্' করে একটা আওয়াজ হয়; স্কুলবাড়িটার সামনে গাড়িটাকে পার্ক করার সময় অমনি আওয়াজ হল বারকয়েক। হ্যারির কানে অবশ্য ঢুকল না, কারণ সে তখন ডাক্তার নিকলসনের কথাগুলো নিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন।

খাটো-বুদ্ধির ছেলেমেয়েদের জন্য এ অঞ্চলে ওই একটাই স্কুল। ছাত্রছাত্রীর অভিভাবক আর শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মিটিং আজ। বড় হলঘরটায় যে জনাকুড়ি মানুষ জড়ো হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে হ্যারি চিনতে পারল, শুধু স্কুলের প্রিন্সিপাল মিসেস অ্যাডলারকেই। ভদ্রমহিলা একজন সাদা চুলওয়ালা লোকের সঙ্গে নিচুগলায় কী নিয়ে যেন আলোচনা করছেন। 'আচ্ছা, এই মুহূর্তে কি ওঁর সঙ্গে গিয়ে কথা বলাটা ঠিক হবে?'—হ্যারি মনে মনে ভাবল।

এখন বিকেল পাঁচটা। অভিভাবকরা একে একে ঘরে ঢুকছেন। হ্যারি বিষণ্ণমুখে চারধারে তাকায়। ঘরে দুটো বড় ঝাড়বাতি রয়েছে, দূরে একটা ফায়ার-প্লেস। জানলা দিয়ে একটা খেলার মাঠ নজরে আসে।

'একটু সরে বসবেন?'

মহিলাকণ্ঠের আওয়াজে হ্যারি চমকে ওঠে। চেয়ারের পাশে দুজন এসে দাঁড়িয়েছেন; স্বামী-স্ত্রী হবেন নিশ্চয়ই। ভদ্রমহিলার মুখে মৃদু হাসির রেখা।

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।' বলেই বেশ কয়েকটা চেয়ার ছেড়ে বসে হ্যারি।

ভদ্রমহিলা-ভদ্রলোক নিচু গলায় কথা শুরু করেছেন। ওঁরা নিশ্চয়ই নিজেদের ছেলে বা মেয়েকে নিয়ে আলোচনা করছেন, হ্যারি ভাবে। সঙ্গে সঙ্গে নিজের ছেলে টমাসের মুখটা ভেসে ওঠে চোখের সামনে। ন-বছর বয়স হল; ছেলেটা এখনও ভালো করে কথাই বলতে পারে না। হ্যারির চোখের কোণে জল চিকচিক করে।

BanglaBook.org

'আপনার কেউ এই স্কুলে পড়ে নাকি?' পাশের ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করেন।

'আজ্ঞে, হ্যাঁ। আমার ছেলে।' হ্যারির মুখে ম্লান হাসি ফোটে। 'এ বছরই ভর্তি করেছি।'

'আমার ছেলেকেও তা এবারেই ভর্তি করলাম,' পাশের ভদ্রলোক খানিকটা উচ্ছ্বাসের সঙ্গেই যেন বলে ওঠেন, 'আমরা অবশ্য এবছরই এই জায়গায় এসেছি। এর আগে যেখানে ছিলাম সেখানকার লোকেরা বলত—ওকে দেখে নাকি জড়বুদ্ধি বলে মনেই হয় না!'

হ্যারি চুপচাপ শুনে যায়। ভদ্রলোক বলে চলেন, 'আরে, আমার পরিচয়টাই তো দিইনি। আমার নাম মারে লোগান; আর এই আমার স্ত্রী সিলিয়া। তা, এ স্কুলটা মন্দ নয়, কী বলেন?'

'তাই তো মনে হয়।'

'আমার ছেলেও বলে—স্কুলটা নাকি ওর ভালোই লাগছে।' ভদ্রলোক ফিসফিস করে বলে ওঠেন। 'আপনার ছেলে কী বলে?'

'আমার ছেলে কথাই বলতে পারে না।' বিষণ্ণ গলায় বলে ওঠে হ্যারি। 'মস্তিষ্কের জন্মগত দোষ; মিসেস অ্যাডলার অবশ্য আশা দিয়েছেন—চেষ্টা করলে ভবিষ্যতে ওকে নিয়ে নাকি কিছু কিছু কথা বলানো যাবে।'

'এবার বোধহয় মিটিংটা শুরু হবে।' পাশের ভদ্রলোক সামনের দিকে ঝুঁকে বসেন। হ্যারি দেখে, স্কুলের প্রিন্সিপাল তাঁর ভারী শরীরটা নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন।

'যাঁদের আজ আসবার কথা, আশা করি তাঁরা সকলে এসে গেছেন।' মিসেস অ্যাডলার তাঁর ভাষণ শুরু করেন।

হ্যারির মনে পড়ে, ভদ্রমহিলার সঙ্গে প্রথম যেদিন দেখা হয়েছিল সেদিনটার কথা। স্ত্রী মার্গারেটও সেদিন ছিল হ্যারির সঙ্গে। টমির বয়স তখন বছর দুই কি আড়াই। মিসেস অ্যাডলার সেদিন অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন ওকে। তারপর একটা ওষুধের নাম লিখে তিনমাস ধরে খাওয়াতে বলেছিলেন। না, ওই ওষুধে অবশ্য টমাসের কোনো পরিবর্তন হয়নি; পরের বার দেখা করতেই টমাসের নামটা ওয়েটিং-লিস্টে তুলে নিয়েছিলেন। সেও তো প্রায় ছ-বছর আগের কথা। মিসেস অ্যাডলারের স্কুলে জায়গা পেতেই এতগুলো বছর কেটে গেল।

'এটাই আমাদের এ বছরের প্রথম মিটিং।' স্মৃতির পাতা থেকে সরে এসে মিসেস অ্যাডলারের কথাগুলো শোনার চেষ্টা করে হ্যারি। 'ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠানোর ব্যাপারে আপনাদের কি কোনো অসুবিধে হচ্ছে?'

BanglaBook.org

একজন বয়স্ক লোক উঠে দাঁড়ান। অন্তত বছর ষাটেক বয়স তো হবেই। জামা-কাপড়ের বাহার দেখে ভদ্রলোকের আর্থিক অবস্থাটা অনুমান করতে কষ্ট হয় না।

'প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের যেসব সুযোগ-সুবিধে পাওয়ার কথা—আমাদের ছেলেমেয়েরা কি তা পাচ্ছে? আমাদের সরকারের কি এই স্কুলকে একটা বাস কিনে দেওয়া উচিত নয়? ছেলেমেয়েরা স্কুল-বাসে আসাযাওয়া করলে আমাদেরও আর চিন্তা থাকে না, কী বলেন?' সমর্থনের আশায় ভদ্রলোক এদিক ওদিক তাকান।

'সরকার কিস্যু করবে না।' এক মহিলা রাগী গলায় বলে ওঠেন। 'সরকারের কাছে তো কম আবেদন-নিবেদন করা হয়নি। আমাদের এখন খবরের কাগজে চিঠি পাঠানো দরকার।'

'উঁহু। আমার মনে হয়—আমাদের এই স্কুলটার এখনও পাবলিসিটির যথেষ্ট অভাব রয়েছে। মিসেস অ্যাডলার এই স্কুলের বাচ্চাদের জন্য যা করছেন তা যদি ভালোভাবে প্রচার করা যায়, তবে নিশ্চয়ই অনেকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবেন।'

হ্যারি জানে, এ ধরনের আলোচনার কোনো শেষ নেই। মারে লোগান হঠাৎ হ্যারির কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলেন, 'প্রথমে যিনি বলতে উঠলেন—চেনেন নাকি ওঁকে?'

'না তো।'

'শুনেছি, এই স্কুল-বাড়িটা তৈরির টাকা দিয়েছিলেন ভদ্রলোক। ওঁর মেয়েটা তো প্রথম থেকেই রয়েছে এ স্কুলে। মোটাসোটা গোলগাল চেহারা—দেখেননি ওকে?'

হ্যারি মনে করার চেষ্টা করে। ইতিমধ্যে আলোচনার বিষয় পাল্টেছে। হ্যারি শুনতে পায়—স্কুলের আর্থিক সমস্যা সমাধানের জন্য চাঁদা তোলার কথা হচ্ছে।

'আচ্ছা, আমরা তো অনায়াসেই একটা গানবাজনার জলসা করতে পারি, কী বলেন?' একজন কমবয়সি মহিলা বলে ওঠেন। 'আমরা যদি এক একজন বিশ-ত্রিশটা টিকিট বিক্রি করি তবেই তো বেশ কিছু অর্থ উঠে আসে।'

'আমরা কে কত টিকিট নেব তা এখনই জানিয়ে দিতে বাধা আছে?' আর একজন উৎসাহী মানুষ প্রশ্ন করেন।

হ্যারি উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'আমার নাম হ্যারি ভ্লাদেক। লোকের সঙ্গে

BanglaBook.org

আমার চেনা-পরিচয় কম। আমি বোধহয় গোটা দশেকের বেশি টিকিট বেচতে পারব না।'

'এটা ঠিকই যে আমাদের অনেকের পক্ষেই ত্রিশজন খদ্দের জোগাড় করা বেশ মুশকিল। তবে কিনা, এটা আমাদের সামাজিক দায়িত্ব। সেটা মনে রেখেই আমাদের চেষ্টা চালাতে হবে।'

'এ প্রসঙ্গে আপনাদের একটু মনে করিয়ে দিই', স্কুলের একজন শিক্ষক বলতে থাকেন, 'এখানে একজন সাইকোলজিস্ট নেওয়া দরকার। বাচ্চাদের কথা বলার ট্রেনিং দেওয়ার জন্য আরও একজন স্পিচ-থেরাপিস্ট চাই; স্কুল-বাড়িটাও রঙ্ করা দরকার। এসবের জন্য বাড়তি টাকা নিশ্চয়ই আপনাদের কাছ থেকে আদায় করাটা ঠিক হবে না। মানে, স্কুলের মাইনে বাড়াতে যে আমরা মোটেই আগ্রহী নই, তা তো আপনারা জানেনই—'

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর মিসেস অ্যাডলার আবার উঠে দাঁড়ান।

'আপনারা সবাই যে এই স্কুলের উন্নতির জন্য চিন্তা-ভাবনা করছেন, এতে যে আমার কী আনন্দ হচ্ছে! এটুকু শুধু বলতে পারি—আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা চালাচ্ছি। আপনাদের ছেলেমেয়েদের অনেকেই এখন সহপাঠীদের সঙ্গে মেলামেশা করছে; কেউ কেউ অন্যদের সঙ্গে খাবারদাবার ভাগ করে খাচ্ছে। এই তো, আমার সামনেই রয়েছেন মিস্টার আর মিসেস লোগান। আপনাদের ছেলে তো দারুণ মিশুকে!'

'সত্যি?' মারে লোগান উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। 'শুনছ গো, আমাদের ভার্ন-এর কথা বলছেন।'

হ্যারি উঠে দাঁড়ায়। এবারে বাড়ি ফেরা দরকার। মার্গারেট ওর ফেরার অপেক্ষায় রয়েছে।

'আরে উঠে পড়লেন যে? কফি আসছে আমাদের জন্য।' মিসেস লোগান বলে ওঠেন।

মিসেস অ্যাডলার হ্যারির দিকে এগিয়ে এসে বলেন, 'কেমন লাগল আজকের মিটিংটা?'

'না, আমি আসলে এসেছিলাম একটা বিষয়ে আপনার একটু পরামর্শ নিতে।' হ্যারি আমতা আমতা করে বলে 'আচ্ছা, আমাদের টমি কি কোনোদিনই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে উঠবে না?'

'আমি তো আগেই বলেছি—কোনো মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুকে ম্যাজিকের

BanglaBook.org

সাহায্যে আমরা সুস্থ-স্বাভাবিক করে তুলতে পারি না। এখানে থাকলে আপনার টমির খানিকটা উপকার নিশ্চয়ই হবে। তবে, আপনাদেরও ওর অসুবিধেগুলো বুঝতে হবে।'

'সারাজীবন ধরেই তাহলে বেচারাকে আমাদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে? যেদিন আমরা থাকব না, সেদিন কী হবে ওর?'

হ্যারির প্রশ্নের কোনো উত্তর জোগায় না মিসেস অ্যাডলারের মুখে।

হ্যারি রাস্তা থেকেই দেখল, মার্গারেট চুপচাপ বসে আছে জানলার ধারে।

'কেমন আছে ও?'

'খারাপ নয়।' মার্গারেট অস্ফুটস্বরে জবাব দেয়। 'একা শুতে চাইছিল না; ওর পাশে গিয়ে শুতে তবে ঘুমোল।'

হ্যারি জুতোর ফিতে খোলে।

'ডাক্তার নিকলসন আবার ফোন করেছিলেন।' মার্গারেট জানায়।

'তোমাকে বিরক্ত করতে বারণ করেছিলাম।'

'না, না, বিরক্ত করবেন কেন? ভদ্রলোকের কথাবার্তা তো খুবই বিনীত। আমি বলেছি, বাড়ি ফিরেই তুমি ওঁকে ফোন করবে।'

'আজ রাত হয়ে গেছে মার্গারেট। কাল সকালে দেখা যাবে।' শোবার ঘরের দিকে এগোয় হ্যারি।

'না, তা হয় না।' মার্গারেট উঠে দাঁড়ায়। 'এখনই তোমার ওঁর সঙ্গে কথা বলা উচিত। তুমি বুঝতে পারছ না, আজ রাতেই উনি আমাদের মতামতটা জানতে চান?'

'রাতের মধ্যেই জানতে চান?' উত্তেজিত গলায় বলে ওঠে হ্যারি। 'তুমি আমায় কী করতে বলো? আচ্ছা, এতবড় একটা ব্যাপারে এমন চট করে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়?'

'আমি তোমায় কোনো চাপ দিচ্ছি না। কিন্তু ওঁদেরও তো হাতে সময় নেই। তোমার মতামতের ওপর যে অনেক কিছু নির্ভর করছে।'

হ্যারি হতাশভাবে মার্গারেটের দিকে তাকায়। কফির কাপটা হ্যারির দিকে এগিয়ে দিয়ে মার্গারেট ধীরে ধীরে বলে, 'আমরা কিন্তু ওঁদের প্রস্তাবে রাজি হয়েছিলাম। তুমি শুধু মিসেস অ্যাডলারের সঙ্গে একবার কথা বলে নিতে চেয়েছিলে।'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ, কথা বলেছি। উনি অবশ্য কোনো ভরসা দেননি।'

'সে তো জানতামই। তবে আর কীসের জন্য সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করছ তুমি?' মার্গারেটকে অধৈর্য দেখায়।

ক্রিং ক্রিং করে ফোন বাজে। 'নিশ্চয়ই ডাক্তার নিকলসন'—বলে ওঠে মার্গারেট।

হ্যারি ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে ফোন ধরে। তারপর শান্তকণ্ঠে বলে, 'আমি এখনও কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারিনি, ডাক্তার। আপনি কি বড্ড বেশি তাড়া দিচ্ছেন না?'

'কী করব? পরিস্থিতিটাই এমন—' ফোনের মধ্যে ডাক্তারের কথাগুলো কেমন করুণ শোনায় 'ছেলেটার হৃৎপিণ্ড থেমে গেছে এক ঘণ্টা আগে—'

'তার মানে, ছেলেটি মারা গেছে?' হ্যারি চেঁচিয়ে ওঠে।

'মারা গেছে, বলি কী করে? হার্ট-লাভ্ মেশিন দিয়ে এখন ওর শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজটা চালানো হচ্ছে। আমরা এ অবস্থায় ওর শরীর আর মস্তিষ্ককে ষোল-আঠারো ঘণ্টার বেশি অবশ্য বাঁচিয়ে রাখতে পারব না। আপনাদের জন্য প্লেনের তিনটে সিট রিজার্ভ করে রেখেছি। আপনারা যদি আর দেরি না করেন, তবে ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে এখানে পৌঁছবেন। তারপরও খানিকটা সময় হাতে থাকবে—তবে তা অবশ্যই খুব বেশি নয়।'

'আমি কিছু ঠিক করতে পারছি না। আমার মাথায় কিচ্ছু আসছে না। কী বললাম, বুঝতে পারছেন?' হিস্টিরিয়া রোগীর মতন চেঁচাতে থাকে হ্যারি।

'আপনি একটু শান্ত হোন, মিস্টার ভ্লাদেক।' ডাক্তার নিকলসনের স্থির কণ্ঠস্বর তারের মধ্যে দিয়ে ভেসে আসে। 'আপনার মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি। তবু একবার এখানকার এই ছেলেটির বাবা-মা'র কথাটা চিন্তা করুন। ওঁরা শুধু চান—ওঁদের মৃত সন্তান আবার আপনাদের টমির মধ্যে বেঁচে উঠুক। আপনি তো জানেন, ওঁদের ছেলেটি কী অসাধারণ বুদ্ধিমান আর চনমনে স্বভাবের ছিল! এমন একটা দুর্ঘটনায় না পড়লে ছেলেটি যে একদিন সকলের নজর কাড়ত, তাতে সন্দেহ নেই।'

'আপনি লোভ দেখাচ্ছেন?' হ্যারির স্বর রীতিমতো ক্রুদ্ধ শোনায়। 'হাবাগোবা টমির বদলে আমি পাব একটা বুদ্ধিমান, হাসিখুশি ছেলেকে—এই তো?'

'না, আমি শুধু বলছিলাম—আপনি ইচ্ছে করলে একটা চৌকশ, মেধাবী ছেলেকে বাঁচাতে পারেন।'

BanglaBook.org

'আর সেটা করতে গিয়ে আমার ছেলেটাকে মেরে ফেলতে হবে! সে যাক গে, আপনি কি গ্যারান্টি দিতে পারেন—আপনার অপারেশন পুরোপুরি সফল হবে?'

'তা পারি না,' নিঃসঙ্কোচে বলেন ডাক্তার, 'তবে আপনাকে তো এর আগে আমাদের যাবতীয় এক্সপেরিমেন্টের কথা জানিয়েছি। শিম্পাঞ্জি গরিলাদের ক্ষেত্রে একজনের মস্তিষ্ক অন্যের খুলির ভেতর বসাতে আমরা সক্ষম হয়েছি। মানুষের মস্তিষ্ক বদলের চেষ্টা অবশ্য এই প্রথম, তবে যেভাবে আমরা প্রস্তুতি নিয়েছি তাতে বিফল হওয়ার সম্ভাবনা কম। আপনাকে তো আগেই বলেছি, মিস্টার রবার্টের ছেলের অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার পর আমরা যখন বুঝলাম—ওর আয়ু আর মাস কয়েকের বেশি নয়, তখন থেকেই গোটা দেশের জড়বুদ্ধি ছেলেদের বায়োডাটা ঘাঁটতে শুরু করি আমরা। শেষ পর্যন্ত ছেলেটির শারীরিক গড়ন-গঠন আপনার টমির সঙ্গে হুবহু মিলে যাওয়ার পরই আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। আমার বিশ্বাস—টমির শরীর নতুন একটা মস্তিষ্ক গ্রহণে কোনোরকম আপত্তি করবে না।'

একনাগাড়ে কথাগুলো বলে ডাক্তার নিকলসন থামেন। হ্যারি কী বলবে বুঝতে পারে না।

'কিছু বলুন, মিস্টার ভ্লাদেক।'

'আমাকে অন্তত আধ ঘণ্টা সময় দিন।' বলেই ফোনটা নামিয়ে রাখে হ্যারি।

কফিটা ঠান্ডা হয়ে গেছে। কাপটা নাড়াচাড়া করতে করতে হ্যারি ভাবে—দক্ষিণ আফ্রিকায় ডাক্তার বার্নার্ড একদিন মানুষের হৃৎপিণ্ড বদলে দিয়েছিলেন। কিডনি, চোখ, শরীরের অন্য সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বদলানো তো এখন নিত্যকালের ঘটনা। কিন্তু তাই বলে—একজনের অপরিণত মস্তিষ্ক কেটে বাদ দিয়ে অন্য একটা মস্তিষ্ক বসিয়ে দেওয়া! ব্যাপারটা ভাবতে গিয়ে মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে হ্যারির।

মার্গারেট এসে কাঁধে হাত রাখে। বলে, 'চলো, ওপরে টমির ঘরে যাই।'

'আমরা তাহলে শেষপর্যন্ত ওকে খুন করতে চলেছি, কী বলো?' বিড়বিড় করে বলে ওঠে হ্যারি।

'এভাবে বলছ কেন? আমি তো তোমাকে শুধু টমির কাছে গিয়ে দাঁড়াতে বলেছি. টমির মুখের দিকে তাকিয়ে আমরা ঠিক করব—ওর মস্তিষ্ক পাল্টে ফেলব কি না।' মার্গারেটের চোখে জল।

BanglaBook.org

একটা একটা করে সিঁড়ির ধাপগুলো পেরিয়ে টমির পাশে গিয়ে দাঁড়ায় ওরা। ওর ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আর এক টমির মুখ ভেসে ওঠে হ্যারির চোখের সামনে। জবুথবু, বুদ্ধিহীন মুখের বদলে বুদ্ধিদীপ্ত, চঞ্চল একটা ছোট্ট ছেলের মুখ। সেই ছেলেটা দৌড়চ্ছে, খেলছে, বাবা-মায়ের সঙ্গে অনর্গল কথা বলছে, কার্ডবোর্ডের টুকরো দিয়ে এরোপ্লেন বানাচ্ছে—

আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে ড্রয়িংরুমে রাখা টেলিফোনটার কাছে এগিয়ে যায় হ্যারি।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

শুধু একজন

ইগর রসোখোভাৎস্কি

ট্রাকটাকে এলোপাথাড়িভাবে ছুটে আসতে দেখেই পথচারীরা সরে দাঁড়িয়েছিল রাস্তার ধারে—বাড়ি আর দোকানগুলোর একেবারে গা ঘেঁষে। তবু শেষরক্ষা হল না। রাস্তার গর্তগুলোয় জমে থাকা নোংরা জল এসে লাগল অনেকেরই গায়ে। তামাকের ছোপ-লাগা দাঁতগুলো বের করে কেমন বিচ্ছিরিভাবে হাসছিল ট্রাক-ড্রাইভারটা।

ভিক্টর নিকোলায়েভিচ্ একবার তাকাল নিজের প্যান্টের দিকে, অন্তত তিন-চার জায়গায় কাদার দাগ লেগেছে। বাড়ি ফেরার পর এ নিয়ে যে বউ-এর সঙ্গে যথেষ্ট অশান্তি হবে—তা মনে মনে আঁচ করে নিতে কষ্ট হল না ওর।

লম্বা লম্বা পা ফেলে ভিক্টরকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল যে ছেলেটি—তাকে দেখে চিনতে না পারার কথা নয়। ওদের ইন্সটিট্যুটের ল্যাবরেটরি-অ্যাসিস্ট্যান্ট, তরতাজা তারুণ্যে সবসময় যেন টগবগ করে ফুটছে! ভিক্টরও একসময় অমন সতেজ ছিল; পথ চলার সময় অন্য কারোর দিকে নজরই দিত না। এখন এই ঊনপঞ্চাশ বছর বয়সে অবশ্য যৌবনের চঞ্চলতার কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। আত্মীয়স্বজন-বন্ধুবান্ধব-সহকর্মীরা ওকে নিরীহ-নিষ্কর্মা বলেই মনে করে। এত বছর গবেষণার পরও নিজের ডক্টরেট ডিগ্রিটা বাগাতে পারেনি বেচারা!

তা, গবেষণার স্বীকৃতি না পাক, ওর এতদিনের সাধনা যে ব্যর্থ হয়নি—এটা ভেবেই মনটা খুশিতে ভরে ওঠে ভিক্টরের। হ্যাঁ, মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে বহুগুণ বাড়ানোর কৌশল ওর আয়ত্তে এসেছে। সেই কতবছর আগে—মানসিক রোগের হাসপাতালে গিয়ে গবেষণার এই বিষয়টা ওর মাথায় এসেছিল। মানসিক রোগীদের অনেকেই যে মাঝেমাঝে উত্তেজিত হয়ে ওঠে, কী প্রচণ্ড আসুরিক শক্তিতে চিৎকার করে, চারপাশের জিনিস ভাঙচুর করে—তাও দেখেছিল। পাঁচজন জোয়ান মিলে একজন রোগীকে টেনে ধরে রাখতে পারে না; আবার এমন অনেক রোগী দেখেছে, হাজার চেষ্টাতেও যাদের একফোঁটা জল খাওয়ানো

BanglaBook.org

যায় না। ওইসব রোগীদের অপরিসীম একগুঁয়েমির জন্য যে স্নায়ুর ভেতরকার 'কে-নিউরোন' দায়ি, তা জানা ছিল ভিক্টরের। মানসিক রোগীদের শরীরে 'কে-নিউরোন'-গুলি বেশিমাত্রায় সক্রিয় হয়ে উঠলে ওরা যে ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড অশান্ত হয়ে ওঠে—তা প্রমাণিত হয়েছিল বহু আগেই। বস্তুত একদল শরীরবিজ্ঞানী এমন এক কায়দা রপ্ত করার চেষ্টাও চালাচ্ছিলেন যার সাহায্যে ওই বিশেষ ধরনের নিউরোনকে নিষ্ক্রিয় করে রোগীদের আবার স্বাভাবিক করে তোলা যায়।

একমাত্র ভিক্টরই কিন্তু প্রথম থেকেই সমস্যাটাকে দেখেছে একেবারে অন্যভাবে। ও নিজেকে প্রশ্ন করেছে, 'এমন কিছু কী করা যায় না যাতে সুস্থ স্বাভাবিক লোকের মধ্যে 'কে-নিউরোন'গুলিকে সংহত করে তাদের ইচ্ছাশক্তিকে বহুগুণ বাড়িয়ে তোলা যাবে—অথচ তাদের মধ্যে মানসিক রোগের অন্যান্য লক্ষণ দেখা দেবে না?'

............রাস্তার ওপরে একটা সাজানো-গোছানো দোকান—কাচের ভেতর দিয়ে নানা মডেলের টেলিভিশন-সেট দেখা যাচ্ছে। কাচের এপার থেকে সেটগুলির দাম পড়ার চেষ্টা করে ভিক্টর। ইন্সটিট্যুট থেকে টাকা ধার করে একটা টেলিভিশন এবারে না কিনলেই নয়। বেচারা-বউটার সুখ-আহ্লাদের দিকে তো কখনই তেমন নজর দিতে পারেনি। মুখে যদিও কখনও বলেনি, কিন্তু বাড়িতে টেলিভিশন নিয়ে গেলে নিশ্চয়ই খুশি হবে বউ।

দোকানটা ছাড়িয়ে এগোতেই আবার নিজের গবেষণার বিষয়টা মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি দেয়। সেই প্রথম যখন ও ল্যাবরেটরিতে কাজ শুরু করেছিল তখন থেকে আজ পর্যন্ত এই এতগুলো বছর ধরে ওর কথাগুলোকে পাগলের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দিয়েছে সহকর্মীরা। এমনকী, প্রাণের বন্ধুকেও তো বোঝানোর কত চেষ্টা করছে ও। বলেছে, 'প্রচণ্ড প্রেরণা বা ইচ্ছাশক্তির জোরে মানুষ যে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে—এটা কি তুমি মানো না? মুমূর্ষু রোগী শুধুমাত্র মনের জোরে দিনের পর দিন বেঁচে রয়েছে, এমনকী যে রোগীর বাঁচার কোনো সম্ভাবনা নেই, ডাক্তাররা যাকে জবাব দিয়ে গেছে—সেও যে ওষুধ ছাড়া দিব্যি বেঁচে উঠেছে—এমন ঘটনা তো বিরল নয়। প্রয়োজনের মুহূর্তে সৈনিকের মধ্যেই যে মানসিক দৃঢ়তা দেখা যায়, জরাগ্রস্ত বৃদ্ধও যে দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড়-পর্বত জয় করে, স্রেফ মনের জোরে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ধরে মানুষ যে নৌকো কিংবা ভেলায় চেপে সাগর পারাপার করতে পারে—তা কি তুমি অস্বীকার করো?'

BanglaBook.org

'না, করি না,' মিটিমিটি হেসে জবাব দিয়েছিল মিখাইলভ, 'কিন্তু তাতে কী প্রমাণ হয়?'

'তাতে প্রমাণ হয়, আমাদের সকলের মধ্যেই এক বিশেষ ধরনের শক্তির ভাণ্ডার রয়েছে;' ভিক্টর স্পষ্ট জবাব দেয়, 'কোনো কারণে সেই ভাণ্ডারের মুখ খুলে জমা শক্তি বেরিয়ে পড়লেই মানুষের মধ্যে প্রেরণা যায় বহুগুণ বেড়ে। ঠিক মতো রাস্তা পেলে—হঠাৎ ছাড়া পাওয়া সেই শক্তি মানুষকে দিয়ে অসাধ্যসাধন করিয়ে নেয়; আমরা একেই বলি 'ইচ্ছাশক্তি'। মানসিক রোগীদের ক্ষেত্রে সেই জমা শক্তি সোজা সরল পথে বেরিয়ে আসতে পারে না বলেই যত বিপত্তি! ওদের মধ্যে অপরিসীম মনের জোর ফুটে উঠলেও তা বিপথে চালিত হয়।'

'তোমার যত উদ্ভট চিন্তা!' বলেছিল মিখাইলভ। 'বিজ্ঞানীরা এসব কথা কখনও মানবে না।'

'নিশ্চয়ই মানবে। আমি প্রমাণ করব, আমার ধারণা মিথ্যে নয়।' চোখ-দুটো ঝক্‌ঝক্ করে উঠেছিল ভিক্টরের। 'আমার বিশ্বাস, প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে জমে থাকা ওই বিশেষ ধরনের শক্তিকে মুক্ত করার ব্যাপারে 'কে-নিউরোন'-এর হাত আছে। ল্যাবরেটরিতে ইঁদুর-গিনিপিগের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে আমি দেখেছি—'কে-নিউরোন'কে উত্তেজিত করলে ওদের মধ্যে কী প্রচণ্ড অস্থিরতা দেখা দেয়; হিস্টিরিয়া-গ্রস্তের মতো ওরা ছটফট করতে থাকে—কী প্রচণ্ড শক্তি তখন ওদের গায়ে! আমি বলছি, 'কে-নিউরোন'গুলিকে ঠিকমতো সংহত করে মানুষের মধ্যে জমে থাকা এক প্রচণ্ড ক্ষমতাকে কাজে লাগানোর উপায় একদিন নিশ্চয়ই আবিষ্কৃত হবে। সেদিন দেখবে, ইচ্ছাশক্তির জোরে মানুষ সমস্ত অসুখকে জয় করবে—কোনো ওষুধের আর দরকার হবে না।'

না, ওর কথাগুলো, সেদিন মিখাইলভ বিশ্বাস করেনি। ওকে বাধা দিয়ে বলেছিল, 'তুমি এখন আবেগের বশে কথা বলছ। বিজ্ঞানীরা তোমার এসব কথায় কান দেবে না। ওষুধপত্র লাগবে না—স্রেফ মনের জোরে মানুষ সমস্ত অসুখকে জয় করবে—এ কি মেনে নেওয়া যায়?'

ভিক্টর সেদিন আর কথা বাড়ায়নি; সোজা ফিরে এসেছিল নিজের ল্যাবরেটরিতে। তারপর এই এতগুলো বছর শুধু কতকগুলো স্নায়ু আর বিশেষ ধরনের কিছু নিউরোন-সাইন্যাপ্স নিয়ে পড়ে রইল। শেষ পর্যন্ত, নিজের ধারণাকে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। বলতে গেলে, আজ মাত্র কয়েক ঘণ্টা

BanglaBook.org

আগেই ওর গবেষণার একেবারে শেষ পর্যায়ের কাজটুকুও সাঙ্গ হয়েছে। ও প্রমাণ করেছে—বিশেষ প্রক্রিয়ায় শরীরের মধ্যে আটকে থাকা অব্যবহৃত শক্তির উৎসকে মুক্ত করা সম্ভব; তার ফলে মানুষের মধ্যে বেঁচে থাকার এক প্রচণ্ড প্রেরণা জেগে ওঠে, তার রোগ-প্রতিরোধ-ক্ষমতা বহু-বহুগুণ বেড়ে যায়!

মিখাইলভের সঙ্গে অনেকদিন দেখাসাক্ষাৎ নেই। নিজের সাফল্যের খবরটা ওকেই প্রথম জানানো উচিত। মনে মনে ভাবল ভিক্টর। পরক্ষণেই খেয়াল হল, আগে থিসিসটা গুছিয়ে লিখে ফেলা দরকার; তারপর সেটাকে পেশ করতে হবে বিশেষজ্ঞ-কমিটির কাছে। না হলে, এখন কিছু বলতে গেলেই ফের হয়তো ব্যঙ্গের হাসি হাসবে মিখাইলভ।

নিজের মনে বিড়বিড় করতে করতে ফুটপাথ ছেড়ে রাস্তায় নামে ভিক্টর নিকোলায়েভিচ্। ট্রাফিকের আলোটা লাল হয়ে রয়েছে। খানিকটা অন্যমনস্কভাবেই রাস্তার ওপারের দিকে এগিয়ে যায় সে।........

শেষ মুহূর্তে বাসটা থামানোর জন্য প্রা-।পণে ব্রেক কষেছিল, ড্রাইভার কিন্তু দুর্ঘটনা এড়ানো গেল না। মুহূর্তের মধ্যে গোটা এলাকায় ভিড় জমে গেল। ভিক্টরের দেহটা উপুড় হয়ে পড়েছিল রাস্তার ঠিক মাঝখানে; একটু দূরেই চশমাটা পড়েছিল কাচভাঙা অবস্থায়। মুখের সিগারেটটা মাটিতে পড়েও কেমন জ্বলছিল!

'আমায় একটু দেখতে দিন, আমি ডাক্তার।' বলতে বলতে একজন লোক এগিয়ে এলেন ভিড় ঠেলে। তারপর ভিক্টরের নাড়ী টিপে কিছুক্ষণ বসে থাকার পর এদিক-ওদিক চেয়ে হতাশার ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন। বললেন, 'অ্যাক্সিডেন্টের সঙ্গে সঙ্গেই হার্টফেল করেছে।'

লোকদের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন। বাসযাত্রীদের একজন বলে উঠল, 'ড্রাইভারের কিন্তু দোষ নেই। লোকটা রাস্তার মাঝখান দিয়ে এমনভাবে হাঁটছিল, যেন কোনো কিছুতে হুঁশ নেই!'

ভিড়ের মধ্যে একজন বয়স্ক মানুষকে বেশ অবসন্ন দেখাচ্ছিল। প্রায় স্বগতোক্তির মতো করে তিনি বললেন, 'কী আর করা যাবে? পৃথিবী থেকে একজন বিদায় নিল।'

পাশের লোকটিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখে ভদ্রলোক নিজের বক্তব্যকে খোলসা করতেই বললেন, 'দুনিয়ার পাঁচশো কোটি লোকের মধ্যে যদি এক কোটি লোকও হঠাৎ মরে যায়, তাতেও কি অন্যদের কিছু এসে যাবে? অনেকে হয়তো খেয়ালই করবে না!'

BanglaBook.org

ভিড় ঠেলে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছিলেন ভদ্রলোক। ডাক্তারের চেম্বারে ওঁকে ঠিকসময় পৌঁছতে হবে। উনি জানেন, দুরারোগ্য ক্যানসার ওঁকে ধরেছে। ওঁকে সারিয়ে তোলাটা এখন পৃথিবীর সেরা ডাক্তারদেরও সাধ্যের বাইরে।

উনি শুধু জানতেন না—পৃথিবীর পাঁচশো কোটি লোকের মধ্যে শুধু একজনই পারত—শরীরের মধ্যেকার এক অজানা শক্তির ভাণ্ডারের মুখ খুলে দিয়ে ওঁকে সারিয়ে তুলতে। কিন্তু হায়, সে লোকটাও তো এতক্ষণে সকলের নাগালের বাইরে চলে গেছে!

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

পরীক্ষার দিন

হেনরি স্লেসার

পরীক্ষার ব্যাপারটা নিয়ে কোনোদিন কখনও কথা ওঠেনি জর্ডন পরিবারের মধ্যে। বাড়ির একমাত্র ছেলে ডিকি-র যেদিন বারো বছর পূর্ণ হল, ওর মা মিসেস জর্ডন প্রথম কথাটা তুললেন। ভদ্রমহিলার কথার মধ্যে উদ্বেগের ছাপ লক্ষ করে মিস্টার গর্ডন বললেন, 'আরে একদম চিন্তা করো না। আমাদের ডিকি পরীক্ষায় ঠিক উত্তরে যাবে।'

প্রাতরাশের টেবিলে তিনজনেই উপস্থিত, ডিকি মাঝে মাঝেই খাবার প্লেট থেকে চোখ তুলে বাবা-মায়ের মুখের দিকে তাকাচ্ছিল। ওর চোখ দু'টো ঝকঝকে, বুদ্ধিদীপ্ত হলেও চাউনির মধ্যে একটা নার্ভাস-ভাব ছিল। হঠাৎ পরীক্ষার কথা উঠল কেন এবং তা নিয়ে বাবা-মায়ের এত চিন্তাই বা হচ্ছে কেন তাও বুঝতে পারছিল না। ডিকি শুধু জানত, আজ ওর জন্মদিন; শোবার ঘরের তাকে কয়েকটা উপহারের প্যাকেট খোলার অপেক্ষায় পড়ে আছে; মা একটা দারুণ কিছু রান্না করবেন আজ। জ্ঞান হওয়া অবধি ও দেখে এসেছে—ওর জন্মদিনটায় বাবা-মা খুশিতে ডগমগ করেন, অথচ আজ ওর এই বারো বছরের জন্মদিনে মায়ের চোখ ছলছল, বাবার গলার স্বর ভারী!

'কোন পরীক্ষা?' ডিকি জানতে চায়।

টেবিল থেকে চোখ না তুলে মা উত্তর দেন, 'তেমন কিছু নয়, ওটা হল সরকারি একটা পরীক্ষা যার সাহায্যে বুদ্ধি মাপা হয়। বারো বছর বয়স পূর্ণ হলে সব ছেলেমেয়েকেই ওই পরীক্ষায় বসতে হয়। আগামী সপ্তাহের কোনো একদিন তোমাকেও পরীক্ষায় বসতে হবে।'

'স্কুলে যেমন পরীক্ষা দিই, তেমনই?'

'হ্যাঁ, তাই,' বাবা তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন। 'ওটা নিয়ে চিন্তার কিছু নেই, যাও তুমি গিয়ে কমিকস-এর বইগুলো পড়ো-

ডিকি টেবিল ছেড়ে উঠে ঘরের এক কোণে গিয়ে দাঁড়ায়। ওটা ওর নিজস্ব জায়গা। জানলার ধারে ওর ছোট্ট পড়ার টেবিল [illegible] দেয়ালে বই-এর তাক। জানলা দিয়ে বাইরে তাকায় ও।

BanglaBook.org

'ইস্, আজ যেন বৃষ্টি না হলেই চলছিল না!' স্বগতোক্তির ভঙ্গিতে বলে ওঠে ডিকি। আজ না হয়ে কাল বৃষ্টিটা হলে কী এমন ক্ষতি হত?'

বাবা চেয়ারে হেলান দিয়ে সরকারি খবরের কাগজের পাতা উল্টোচ্ছিলেন। ছেলের কথা কানে যেতে বললেন, 'বৃষ্টি হচ্ছে মন্দ কী? বৃষ্টি না হলে যে ঘাসগুলো বাড়বে না।'

'কেন, বাবা?'

'কারণ ঘাসগুলোর বেড়ে ওঠার জন্য বৃষ্টির জলের প্রয়োজন।'

উত্তরটায় যেন খুশি হল না ডিকি। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার প্রশ্ন করল, 'ঘাসের রং সবুজ কেন?'

'কেউ জানে না। এসব প্রশ্নের কী উত্তর হয়?'

বাবার কথায় একটু দমে গেল ডিকি। তার মাথায় যেসব প্রশ্ন আসে সেগুলির অধিকাংশেরই উত্তর বাবা-মায়ের অজানা। স্কুলে যে কাউকে জিজ্ঞাসা করবে, সে উপায় নেই। সেখানে আবার পড়াশুনোর সবটাই বাঁধা ধরা। মায়ের ডাক শুনতে পায় ডিকি। জন্মদিনের কেকটা এবারে কাটা হবে।

ঘণ্টাখানেক পর আবার জানলা দিয়ে বাইরে তাকায় ডিকি। মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্য উঁকি দেওয়ার চেষ্টা করছে।

'বাবা,' ও বলে ওঠে, 'সূর্য এখান থেকে কতদূরে রয়েছে?'

'বোধহয় হাজার পাঁচেক মাইল,' বাবা উত্তর দেন।

কয়েকদিন পর এক সকালে প্রাতরাশের সময় মায়ের চোখে জলের ফোঁটা নজরে এল ডিকি-র। চোখের জলের সঙ্গে পরীক্ষার সম্পর্কটা মাথায় এলো বাবার কথায়।

'ডিকি, আজ তোমার এক জায়গায় যাওয়ার কথা—'

'মনে আছে, বাবা।'

'চিন্তা করার মতন ব্যাপার নয় মোটেই,' বাবা বলতে থাকেন। 'হাজার হাজার ছেলেমেয়েকে প্রতিদিন এই পরীক্ষায় বসতে হয়। আসলে আমাদের সরকার জানতে চায়, ছেলেমেয়েরা কতটা চালাকচতুর—এই আর কি।'

'স্কুলে তো আমি বরাবর ভালো নম্বর পেয়েছি—'

'এই পরীক্ষাটা অবশ্য একটু আলাদা। ওঁদের ওখানে যাওয়ার পর ওরা তোমায় সরবতের মতো জিনিস খেতে দেবে, তারপর তুমি একটা ঘরে গিয়ে একটা মেশিন জাতীয় জিনিসের সামনে বসবে—

BanglaBook.org

'কী খেতে দেবে?' ডিকি জানতে চায়।

'তেমন কিছু নয়। জিনিসটার স্বাদ অনেকটা পিপারমেন্টের মতন। যাতে তুমি শুধু সত্যি কথাই বলো সেইজন্যই ওই পানীয়টা দেওয়া হবে। এর মানে এই নয় যে, সরকার তোমায় মিথ্যেবাদী বলে মনে করে; তবে জিনিসটা খেলে সত্যি কথা ছাড়া আর কিছু মুখ দিয়ে বেরয় না!'

ডিকির হকচকিয়ে যাওয়া মুখে ভয়ের আলতো ছাপ। মায়ের চোখে চোখে রাখে ও।

'সব ঠিক হয়ে যাবে।' মা ঠোঁটে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করেন।

'নিশ্চয়ই।' বাবা জোরালো গলায় সায় দিলেন। 'তুমি তো খুবই ভালো ছেলে। তোমার পরীক্ষার ফল ভালো হবেই। আজ তোমার পরীক্ষার পর আমরা বাড়ি ফিরে আনন্দ করব, কেমন?'

ডিকি মাথা নেড়ে সায় দেয়।

নির্দিষ্ট সময়ের পনের মিনিট আগেই সরকারি শিক্ষা দপ্তরের প্রকাণ্ড বাড়িটায় তিনজনে একসঙ্গে ঢোকে। স্বয়ংক্রিয় লিফটে চেপে উঠে আসে চারতলায়। চিঠিতে ৪০৪ নম্বর ঘরে গিয়ে দেখা করার নির্দেশ ছিল! অ্যাপ্রন-গায়ে একজন লোক ঘরের বাইরেই হাতে ধরা তালিকায় জর্ডনদের নাম দেখে নিয়ে ভেতরে ঢোকার অনুমতি দেয়।

ঘরের ভেতরটা বেশ ঠান্ডা। একধারের সারি সারি বেঞ্চি আদালতকক্ষের কথা মনে করিয়ে দেয়। ওইসব বেঞ্চিগুলোয় ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি ছেলেমেয়ে আর তাদের বাবা-মা এসে বসে রয়েছেন। এক ভদ্রমহিলা সকলের মধ্যে কতকগুলি কাগজ বিলি করছিলেন। মিস্টার জর্ডন কাগজে চোখ বুলিয়ে দেখলেন—ওটা একটা সাধারণ ফর্ম; ছেলেমেয়ের সম্পর্কে কিছু তথ্য জানার উদ্দেশ্যেই ওটার ব্যবস্থা।

মিস্টার জর্ডন ফর্ম পূরণ করে ভদ্রমহিলার হাতে জমা দিলেন; তারপর ডিকি-র কাছে ফিরে এসে বললেন, 'আর বেশিক্ষণের ব্যাপার না। তোমাকে ওরা যেই নাম ধরে ডাকবে অমনি ওই দিকের দেয়ালের ওই দরজা দিয়ে তুমি ভেতরে যাবে—'

এগারোটা বাজার ঠিক পাঁচ মিনিট আগে ডাক এল।

'যাও, এবারে এগিয়ে যাও,' ডিকির দিকে না তাকিয়েই বাবা বলে উঠলেন। মা কপালে চুমু দিলেন। দরজার দিকে এগোতে এগোতে ডিকি শুনতে পেল—

BanglaBook.org

মা বলছেন, 'তোমার পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা এখানেই অপেক্ষা করব...

বড় ঘরটার ভেতরে আলো কম। ছাই-ছাই রঙের ইউনিফর্ম পরা একটা লোক ডিকি-র দিকে এগিয়ে এলো। ঘরের একপাশে একটা উঁচু টুল দেখিয়ে বলল, 'ওখানে বসো। তোমার নাম রিচার্ড জর্ডন?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ।'

'তোমার ক্রমিক সংখ্যা ৬০০-১১৫। এটা খেয়ে নাও রিচার্ড।'

লোকটার হাত থেকে প্লাস্টিকের কাপটা নিয়ে টুলের ওপরে গিয়ে বসল ডিকি। বাবা বলেছিলেন, পানীয়টায় পিপারমেন্টের স্বাদ থাকবে, খাওয়ার সময় তেমনটা লাগল না ডিকি-র, বরং দুধের সঙ্গে অনেক মিল। এক চুমুকে শেষ করে খালি কাপ লোকটার দিকে এগিয়ে দিল ডিকি। সে যেন কাগজের ওপর কীসব লিখছিল। খানিক পরে হঠাৎ এগিয়ে এসে ডিকি-র চোখের মধ্যে পেন্সিল-টর্চের আলো ফেলে কীসব দেখল।

'ঠিক আছে, আমার সঙ্গে এবার ওঘরে চলো।'

পাশের ঘরটার ঠিক মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড কম্পিউটার জাতীয় মেশিন আর সেটার মুখোমুখি একটা মাত্র হাতল দেওয়া চেয়ার; ডিকি ঘরে ঢুকতেই যান্ত্রিক স্বরে চেয়ারটায় বসার নির্দেশ এল। সঙ্গের লোকটি ডিকিকে চেয়ার অবধি এগিয়ে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যেতেই সেই অদ্ভুত যন্ত্রটা থেকে কথা ভেসে এল—'আরাম করে বসো, রিচার্ড। তোমায় কতকগুলো প্রশ্ন করা হবে এবং তুমি বেশ ভেবে-চিন্তে সেগুলির উত্তর বলবে। প্রশ্নগুলোর কোনও কোনওটা অঙ্কের ধাঁধা বলে মনে হতে পারে। আসলে ওগুলো সব বুদ্ধির প্রশ্ন।'

'বুঝলাম।' ডিকি-র মধ্যেকার উৎকণ্ঠা কমে আসে।

'তুমি যদি বলো তবে প্রশ্নগুলো শুরু করতে পারি।'

'আমি রেডি।' ডিকি নড়েচড়ে বসে।

যন্ত্রের গায়ে কতকগুলো আলো জ্বলতে নিভতে থাকে। একটা ঘড়ঘড় শব্দ হয়। তারপর যান্ত্রিক স্বরে কথা ভেসে আসে—'কোন সংখ্যার সারির প্রথম চারটে সংখ্যা ১,৪,৭,১০ হলে পরের সংখ্যাগুলো কী কী হবে?'

প্রশ্নটা একেবারেই সোজা। সংখ্যাগুলো ৩ করে বেড়ে চলেছে। বেশ উৎসাহের সঙ্গে জবাব দেওয়া শুরু করে ডিকি।

মিস্টার আর মিসেস জর্ডন চারতলার সেই প্রথম হলঘরটায় ঠায় বসেছিলেন। বিকেল প্রায় চারটের সময় স্লিপ হাতে এক কর্মচারি এগিয়ে এল ওঁদের দিকে।

BanglaBook.org

'মিস্টার জর্ডন?'

'হ্যাঁ।' স্বামী-স্ত্রী দুজনেই একসঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন।

'আপনার ছেলে রিচার্ডের ক্রমিক সংখ্যা ৬০০-১১৫; একটু আগেই ওর পরীক্ষা শেষ হয়েছে। দুঃখের সঙ্গে আপনাদের জানাচ্ছি, সরকারি বিধির ৮৪ নম্বর ধারার ৫ নম্বর উপধারা অনুযায়ী বারো বছরের ছেলেমেয়েদের আই-কিউ বা বুদ্ধি যে সীমার মধ্যে থাকা উচিত, আপনাদের ছেলের আই-কিউ তার চেয়ে যথেষ্ট বেশি বলে জানতে পারা গেছে—'

কর্মচারিটির কথা শেষ হওয়ার আগেই ডিকি-র মায়ের গলা দিয়ে অস্ফুট আওয়াজ বেরিয়ে আসে; বাবার মুখও ফ্যাকাসে সাদা দেখায়।

কর্মচারিটি বলে চলেন, 'আপনাদের ছেলেকে ফেরত না পাবার দরুন প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ সরকার থেকে অবশ্যই পাবেন। এখান থেকে বেরিয়ে ৪০৯ নম্বর ঘরে গেলেই ক্ষতিপূরণ দাবির যথাযথ ফর্ম পেয়ে যাবেন...'

কথাগুলো আর কানে ঢুকছিল না জর্ডন-দম্পতির।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

আজব ডিম

বিল ব্রাউন

পুরো ব্যাপারটাই কেমন যেন গোলমেলে ঠেকছে। একটা প্লেন-অ্যাকসিডেন্ট হল, অথচ লোকজনের কোনো ভিড় নেই; আসার পথে রাস্তায় একটা অ্যাম্বুলেন্সও চোখে পড়ল না! অ্যালসপ্-এর পুরনো খামারবাড়ির নড়বড়ে সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে র‍্যাফার্টি ভাবল—'দূর ছাই, ফিরেই যাই। এই উড়ো টেলিফোনের খবর বিশ্বাস করাটা উচিত হয়নি—'

অ্যালসপ্-কর্তা বেরিয়ে আসতেই র‍্যাফার্টি নিজের পরিচয় দিল। 'আমার নাম ওয়ার্ড র‍্যাফার্টি; 'দ্য টাইমস্' কাগজ থেকে আসছি।'

কথাটা শেষ করেই র‍্যাফার্টি একবার আড়চোখে বুড়োর মুখের দিকে তাকিয়ে নেভার লোভ সামলাতে পারে না। আসলে, দ্য টাইমস্-এর নামজাদা রিপোর্টারকে চাক্ষুস দেখার পর লোকজনের মুখে যে ভ্যাবাচাকা ভাবটা ফুটে ওঠে সেটা দেখে ওর দারুণ তৃপ্তি হয়।

'র‍্যাফার্টি?' ভদ্রলোক যে দ্য টাইমস্-এর পাঠক নন তা তাঁর ভ্রূ-কুঁচকে তাকানোর ভঙ্গি দেখেই বোঝা যায়।

'আমি খবরের কাগজের রিপোর্টার।' র‍্যাফার্টি বোঝানোর চেষ্টা করে। 'খানিকক্ষণ আগে একজন টেলিফোনে বলল, আপনার খামারবাড়িতে নাকি একটা এরোপ্লেন ভেঙে পড়েছে। সেই শুনেই তো দৌড়ে আসা—'

'এরোপ্লেন? কই না তো।' অ্যালসপের চোখেমুখে বিস্ময়।

দরজার পরদা সরিয়ে অ্যালসপ্-গিন্নি বেরিয়ে আসেন। পুরো ঘটনাটার পুনরাবৃত্তি করে র‍্যাফার্টি, কিন্তু গিন্নিরও সেই একই উত্তর।

'মনে হয়, স্রেফ উড়ো খবর—' র‍্যাফার্টি ফিরে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়। 'রোজই অবশ্য এরকম কত খবর আসে কাগজের অফিসে। তবে কিনা, লোকটা ফোনে প্লেন-অ্যাক্সিডেন্টের একেবারে নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছিল। ও নাকি দেখেছে—একটা জ্বলন্ত এরোপ্লেন গোঁত্তা খেয়ে একেবারে সোজা এসে নামল আপনাদের বাড়ির লাগোয়া জমিতে.....।'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান।' অ্যালসপ্-গিন্নিকে চিন্তিত দেখায়। 'হ্যাঁ, আজ সকালে ওটা

BanglaBook.org

আমাদের বাগানে এসে নেমেছে বটে, কিন্তু ভেঙে পড়েনি তো। তাছাড়া ওটাকে এরোপ্লেনই বা বলছেন কেন? এরোপ্লেনের মতন ওটার তো কোনো ডানা নেই।'

সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় র‍্যাফার্টি। 'ডানা নেই। তবে কি আজ সকালে কোনো হেলিকপ্টার নেমেছিল আপনাদের এখানে?'

'উঁহু,' অ্যালসপ্-গিন্নি মাথা নাড়েন, 'হেলিকপ্টারের তো মাথার ওপর পাখা থাকে।'

'তাহলে?'

'আমাদের বাড়ির পেছনের বাগানেই তো এখনও রয়েছে ওটা। অ্যালফ্রেড, ভদ্রলোককে বরং ওখানেই নিয়ে যাও। যান, গিয়ে দেখে আসুন; তবে হ্যাঁ, বৃষ্টিতে বড্ড কাদা হয়ে আছে, একটু সাবধানে হাঁটবেন।'

'আসুন, আমার সঙ্গে।'

অ্যালসপ্-কর্তার পেছন পেছন হাঁটতে থাকে র‍্যাফার্টি।

'বুঝলেন, এবারে আমার কপালটা ভালো। মুরগির ছানা হয়েছে অঢেল।' অ্যালসপ্‌কে পুলকিত দেখায়। 'তবে হ্যাঁ, এ অঞ্চলে আমার খামারের মুরগির সুনাম আছে মশাই। মিনোরকাস-মুরগির নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই? আচ্ছা, আপনার কী মনে হয়—আমার এই মুরগিগুলো অন্য গ্রহে গিয়ে এখানকার মতোই ডিম দেবে?

'কোথায় বললেন?'

'অন্য কোনো গ্রহে।' স্বাভাবিক গলায় উত্তর দেন অ্যালসপ্। তারপর র‍্যাফার্টি আর কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই কাঠের ছোট দরজা ঠেলে বাগানের বেড়ার ভেতর ঢুকে যান তিনি। অ্যালসপের পেছন পেছন বাগানের ভেতর ঢুকে সামনে চাইতেই র‍্যাফার্টি বোঝে—তার অ্যাদ্দূর ছুটে আসা একেবারে ব্যর্থ হয়নি।

এদিক ওদিক খড়ের টুকরো ছড়িয়ে থাকা ঘাসজমিটার ওপর যে অতিকায় বস্তুটি পড়ে রয়েছে—পয়লা নজরে সেটাকে আধফোলা প্লাস্টিকের বেলুন বলেই মনে হল র‍্যাফার্টির। নিশ্চয়ই এ অঞ্চলের কোনো খ্যাপাটে লোকের কীর্তি। বেলুনে চেপে চাঁদে যাবার মতলব করেছিল বোধহয়! বোকাসোকা কোনো লোক এই চুপসে-যাওয়া বেলুনটাকেই নির্ঘাত উড়োজাহাজ বলে ভুল করে কাগজের অফিসে খবরটা দিয়েছে। কথাটা ভেবে মুচকি হাসি ফুটে উঠল র‍্যাফার্টির ঠোঁটে।

'এটা নিশ্চয়ই আপনি বানাননি, কী বলেন মিস্টার অ্যালসপ্?'

'না, না, কী যে বলেন!' হেসে ওঠেন অ্যালসপ-কর্তা। 'নিজে বানানো তো দূরের কথা, এটা যে কী করে বানায়—সে সম্পর্কেই আমার কোনো ধারণা নেই মশাই। আসলে, এটাতে চেপে আমাদের বন্ধুরা আজ এখানে এসেছে।'

BanglaBook.org

নাহ্, লোকটার মুখচোখ দেখে তো মনে হয় না—মিথ্যে কথা বলছে। একটু যেন অস্বস্তি বোধ করে র‍্যাফার্টি।

‘আপনার এই বন্ধুরা কারা, মিস্টার অ্যালসপ্?’

‘ভাববেন হয়তো, ঠাট্টা করছি।’ আমতা আমতা করে উত্তর দেন অ্যালসপ্। ‘ওরা যে কারা তা আমি নিজেও ঠিক জানি না। আসলে, ওরা তো ভালোভাবে কথাই বলতে পারে না, মানে কোনো কথাই বলে না আর কি! তবে ওদের সঙ্গে মেশার পর যেটুকু বুঝেছি তাতে মনে হয়—ওদের নাম সম্ভবত ‘হাতুড়ি দিয়ে লোহা-পেটাইওয়ালা।’’

‘অ্যাঁ!!’ চমকে উঠে অ্যালসপের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে চুপসে যাওয়া বেলুনটার দিকে এগিয়ে যেতেই কীসে যেন ধাক্কা খেয়ে ‘ওফ্’ বলে চেঁচিয়ে ওঠে র‍্যাফার্টি।

‘ওহো, আপনাকে তো বলতে ভুলে গেছি, ওদের ওই বেলুন-যানের চারপাশে কী যেন এক অদৃশ্য জিনিসের ঘেরাটোপ দেওয়া আছে,’ র‍্যাফার্টিকে বোঝানোর চেষ্টা করেন অ্যালসপ্। ‘আসলে গ্রামের ছেলেগুলো যা বাঁদর! ওরা যাতে গাড়িটাকে ভেঙে টেঙে না ফেলে তার জন্যই এই ব্যবস্থা।’

‘আপনার ওই বন্ধুরা এখন কোথায়, বলতে পারেন?’ কপালের ফুলে যাওয়া অংশটায় হাত বোলাতে বোলাতে জিজ্ঞাসা করে র‍্যাফার্টি।

‘আরে, সেটা তো আগে বললেই হত। ওরা তো আমাদের বাড়িতেই বসে আছে। তবে হ্যাঁ, আবার বলছি—ওদের সঙ্গে কথাবার্তা চালানো কিন্তু একেবারেই দুষ্কর।’

‘না হয় একবার চোখের দেখাই দেখে যাই।’ র‍্যাফার্টি পেছন ফেরে।

‘বুঝলেন, আমাদের ওই বন্ধুরা প্রথম এখানে এসেছিল বছর ছয়েক আগে।’ বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে কথা শুরু করেন অ্যালসপ্। ‘বলতে পারেন, সেও আমার ওই মুরগির টানে। কটা ডিম চাইতে এসেছিল। ওদের দেশে নিয়ে গিয়ে পোলট্রি বানাবে। তা, আমার কাছে এসে অবশ্য ভালোই করেছিল। হাঁস-মুরগির ব্যাপারটা এ অঞ্চলে আমার চেয়ে আর ভালো কে বোঝে, বলুন?’

‘তারপর?’

‘ডিম তো দিলাম। কিন্তু যেতে না যেতেই সব নষ্ট হয়ে গেল। তা যাবেই তো। রাস্তা তো আর কম নয়—যেতেই নাকি তিন বছর সময় লাগে! তা শেষ পর্যন্ত ওই ডিমের জন্যই আবার ফিরে এসেছে। এবার আর চিন্তা নেই। আমি ওদের একটা ছোট্ট তা-দেবার যন্ত্র দিয়ে দিয়েছি। পথে যেতে যেতেই ডিম ফুটে দিব্যি মুরগি বেরিয়ে আসবে। বুদ্ধিটা মন্দ নয়, কী বলেন?’

BanglaBook.org

'তা তো বটেই।' কোনোরকমে জবাব দেয় র‍্যাফার্টি। তার তখন বিস্ময়ে-উত্তেজনায় দম আটকানো অবস্থা।

'একটা কথা বলে নিই,' সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে মন্তব্য করেন অ্যালসপ্, 'আমাদের ওই ভিনগ্রহের বন্ধুদের সম্পর্কে আর কিছু জানতে হলে আমার গিন্নির শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গতি নেই। ওদের সঙ্গে কথাবার্তা সব উনিই চালান কিনা। তাছাড়া ওদের মধ্যেকার মহিলাটির সঙ্গে আমার গিন্নিরও বেশ ভাবসাব হয়েছে বলে মনে হয়।'

বসার ঘরের দরজাটা ফাঁক করতেই অ্যালসপ্-গিন্নি এগিয়ে এলেন। ভেতরে তাকাতেই র‍্যাফার্টি দেখল, উল্টো দিকের সোফায় বসে আছেন অ্যালসপ্ পরিবারের 'সেই দুই বন্ধু'। দুজনেরই স্বচ্ছ গোলাপী মুখ—অভিব্যক্তির কোনো ছাপ নেই তাতে! চোখ দুটো গোল গোল; দেখলে মনে হয়—কেউ যেন রং দিয়ে মুখের দুপাশে এঁকে দিয়েছে। দুজনেরই মাথার ওপর লিকলিকে শুঁড়; পুরুষ-নারীর তফাত বোঝার কোনো উপায় নেই।

'হ্যাঁ, এই হল মিস্টার র‍্যাফার্টি, খবরের কাগজের রিপোর্টার—এর কথাই বলছিলাম—' বন্ধুদের দিকে চেয়ে বলে উঠলেন অ্যালসপ্-গিন্নি। অমনি ওদের মাথার শুঁড়গুলো কেমন এদিকে-ওদিকে নড়তে লাগল।

'ইয়ে, মানে, আমি কি ওদের সঙ্গে একটু আলাপ করতে পারি?' বেশ নার্ভাস বোধ করে র‍্যাফার্টি।

'স্বচ্ছন্দে। ওরা কথা বলতে ভালোবাসে।' উৎসাহের সঙ্গেই বলে ওঠেন অ্যালসপ্-গিন্নি।

'ওদের নাম যেন কী?'

'না মানে, সেটা ঠিক আমরাও জানি না।' আমতা আমতা করেন গৃহকর্ত্রী। 'ওদের কথাবার্তা আসলে অনেকটা ছবির মতন। যেমন, আপনি ওদের দিকে তাকিয়ে কোনো প্রশ্ন করলেন, ওরা তার উত্তরে কিছু একটা চিন্তা করবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনার মনের মধ্যে ফুটে উঠবে কতকগুলি ছবি—মানে, ব্যাপারটা যে বেশ জটিল তা তো বুঝতেই পারছেন। তা, ওদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করতেই যে ছবিটা ওরা দেখিয়েছে—তাতে একজন লোহার পাতের ওপর হাতুড়ির ঘা দিচ্ছে। ভারতের কোনো কোনো জায়গার মতো ওদের ওখানেও হয়তো যার যার পেশা অনুযায়ী নামকরণ করা হয়।'

শুঁড়ওয়ালা লোক দুটোর দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে নিয়ে র‍্যাফার্টি বলে, 'আচ্ছা, আপনার কি মনে হয়—ওরা আমার সঙ্গে কথা বলবে?'

BanglaBook.org

'নিশ্চয়ই।' অ্যালসপ্-গিন্নি বলেন। 'যে কোনো প্রশ্ন করার পর এইভাবে মাথার ওপর আঙুল তুলুন। আপনি যে উত্তর চাইছেন—সেটা তখন ওরা বুঝে নিয়ে আপনার মাথায় চিন্তার ঢেউ পাঠাবে।'

অ্যালসপ্-গিন্নির দেখাদেখি মাথার উপর আঙুল তুলে ধরে র‍্যাফার্টির নিজেকে একটা আস্ত উজবুক বলে মনে হচ্ছিল। তবু সেই অবস্থায় অ্যালসপ্-গিন্নির দিকে তাকিয়ে বলল, 'আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করুন তো, ওরা কোত্থেকে আসছে।'

'এ প্রশ্নটা অবিশ্যি আগেও ওদের করেছি,' অ্যালসপ্-গিন্নি মুচকি হাসলেন, 'আপনার খাতিরে না হয় আর একবার জিজ্ঞাসা করছি।'

'আপনারা কোত্থেকে আসছেন সেটা ইনি, মানে এই রিপোর্টার ভদ্রলোক জানতে চাইছেন—'

র‍্যাফার্টি দেখল, সামনে বসে থাকা কিম্ভুতকিমাকার চেহারার লোক দুটো শুঁড়সমেত মাথা ঘোরাল তার দিকেই। তারপর—ঠিক তারপরই ঘটল সেই ব্যাপারটা। র‍্যাফার্টির মনে হল। তার মাথার মধ্যে সবকিছু কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। ও যেন উল্কার বেগে ছুটে চলেছে মহাশূন্যে—ওর চারপাশে যেন আলোর সমুদ্র। হঠাৎ ওর মনে হল—একশো সূর্যের দীপ্তিতে উজ্জ্বল এক নক্ষত্র যেন ওর সামনে আলোর সমুদ্রে ভেসে উঠছে! .....র‍্যাফার্টি দেখল তার সমস্ত শরীর কাঁপছে, শিরদাঁড়া দিয়ে নেমে যাচ্ছে আতঙ্কের এক তীব্র অনুভূতি। মাত্র কয়েক মুহূর্তে যেতে না যেতেই অবশ্য চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গেল সবকিছু।

'মিস্টার অ্যালসপ্, মিসেস অ্যালসপ্', উত্তেজনায় চেঁচিয়ে ওঠে র‍্যাফার্টি, 'ওরা যে মহাকাশের কোনে সুদূর নক্ষত্রলোক থেকে এসেছে—তাতে আমার আর সন্দেহ নেই।'

'হ্যাঁ, সেটা তো ওরাও বলেছে।' নির্বিকারভাবে বলে ওঠেন অ্যালসপ্-কর্তা।

'আপনি বুঝতে পারছেন, এর অর্থ কী?' নিজেকে কিছুতেই সংযত রাখতে পারে না র‍্যাফার্টি। 'অন্য জগতের বুদ্ধিমান প্রাণী এসেছে এখানে.......আপনি বুঝতে পারছেন না—এ ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে কোনোদিন ঘটেনি? আপনি-আপনি বুঝতে পারছেন না—খবরের কাগজের পক্ষে এটা কী সাংঘাতিক একটা বিষয়! আমাকে এর একটা প্রমাণ রাখতেই হবে। আচ্ছা, আপনাদের টেলিফোনটা কোথায়?'

'আমাদের বাড়িতে তো টেলিফোন নেই।' অ্যালসপ্ কর্তা বলে ওঠেন, 'টেলিফোন পাবেন এই গ্রামের বাইরে পেট্রোল পাম্পে। তবে আপনি এমন ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? একটু পরেই তো ওরা চলে যাবে। আমাদের দেওয়া ডিমগুলো আর

BanglaBook.org

সেই ডিমে তা-দেওয়ার সরঞ্জাম তো আগেই ওদের উড়োজাহাজে তোলা হয়েছে। ওদের বিদায় নেওয়া পর্যন্ত মাথায় সবুর করে যান।'

'না-না-না,' হিস্টিরিয়ার রোগীর মতন মাথা নাড়তে থাকে র‍্যাফার্টি, 'আপনারা কেন বুঝতে পারছেন না—এত তাড়াতাড়ি ওদের ছেড়ে দেওয়া যায় না? এই মুহূর্তে আমার একজন ফটোগ্রাফার চাই—'

'আরে, আমরাও কী ওদের কম অনুরোধ করেছি!' অ্যালসপ্-গিন্নির মুখে সরল হাসি। 'কত করে বললাম, রাতের খাওয়াটা সেরে যেতে—তা ওরা কী আর শোনে! আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই নাকি ওদের চলে যেতে হবে; চাঁদের অবস্থান-টবস্থান দেখে নাকি ওদের যাত্রা শুরু করতে হয়।'

হতাশ চোখে র‍্যাফার্টি ঘরের এদিক-ওদিক চায়। ইস্, হাতের কাছে যদি একটা টেলিফোন থাকত—এক্ষুনি ও ফোন করে জানিয়ে দিতে পারত চিফ-এডিটরকে। সেক্ষেত্রে অবশ্য ওর কথাগুলোকে পাগলের প্রলাপ বলেও উড়িয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

র‍্যাফার্টির সম্বিত ফেরে। বলে, 'আপনাদের কাছে কি ক্যামেরা আছে? যে কোনোরকম হলেই চলবে। এদের একটা ফটো আমায় তুলতেই হবে।'

'ওহ্, ক্যামেরা? নিশ্চয়ই আছে।' অ্যালসপ্-কর্তাকে বেশ হাসিখুশি দেখায়। 'যদিও পুরনো আমলের বাক্স-ক্যামেরা—কিন্তু ছবি ওঠে চমৎকার। আমার হাঁস-মুরগির যে কত ছবি তুলেছি! দেখবেন নাকি?'

'না, না, ছবি নয়—ক্যামেরাটা আনুন শিগগির।' উত্তেজনায় ঘরময় পায়চারি শুরু করে র‍্যাফার্টি।

'এক মিনিট, আনছি।' অ্যালসপ্-কর্তা দরজার পরদা সরিয়ে ভেতরে গেলেন।

'মিসেস অ্যালসপ্,' চেঁচিয়ে ওঠে র‍্যাফার্টি, 'আমার অনেক প্রশ্ন আছে। আমাদের এখানকার ডিম নিয়ে ওঁরা কী করবেন? ওঁদের মহাকাশযানটা কীসে চলে? ওঁদের জগতের অবস্থানটা ঠিক কোথায়? ওঁরা—'

প্রশ্ন শেষ করার আগেই অ্যালাসপ্-কর্তা ঘরে ঢোকেন। স্ত্রীকে বলেন, 'ওগো শুনছ? ক্যামেরাটা কি তুমি দেখছ? কোথায় গেল ওটা? অবশ্য ফিল্ম-টিল্ম কিছু নেই ওর মধ্যে—'

ধপ্ করে চেয়ারের ওপর বসে পড়েই র‍্যাফার্টি দেখে, মহাকাশের আগন্তুক দুজন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে কেমন শুঁড় নাড়ছে। বোধহয় নিজেদের মধ্যে কোনো শলাপরামর্শ সেরে নেয় ওরা। তারপর চোখের পলক ফেলার আগেই বিদ্যুৎবেগে বেরিয়ে যায় ঘরের বাইরে, বাগানের দিকে।

BanglaBook.org

'আপনারা থামুন!' ভাঙা গলায় আর্তনাদ করতে করতে র‍্যাফার্টি ছুটল তাদের পেছনে। বাগানের কাছে পৌঁছনোর আগেই ইঞ্জিনের মৃদু গর্জন কানে আসে। আর তারপরেই—র‍্যাফার্টির ছানাবড়া হয়ে যাওয়া চোখদুটোর সামনে বিশাল সেই প্লাস্টিকের বেলুনটা ছোট্ট লাফ খেয়ে ওপরে উঠেই সাঁ-করে সন্ধের আকাশে বেমালুম মিলিয়ে যায়!

হতাশভাবে বাগানের কাদার ওপরেই বসে পড়ল র‍্যাফার্টি। কোনো ছবি নেই, কোনো প্রমাণ নেই—পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর ঘটনা রিপোর্ট করার এমন সুযোগটা ভিনগ্রহীদের মতোই মহাশূন্যে মিলিয়ে গেল!

আহা, একটা কোনো প্রমাণ থাকলেও 'দ্য টাইমস্'-এর প্রথম পাতায় বড় বড় হরফে লেখা যেত—'গত রবিবার স্থানীয় আলফ্রেড অ্যালসপ্-এর খামারবাড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন ভিনগ্রহের শ্রী ও শ্রীমতী...., ফিরে যাওয়ার সময় তাঁরা দু-টুকরি মুরগির ডিম সঙ্গে করে নিয়ে যান—'

নাহ্, কোনো প্রমাণ নেই। আর প্রমাণ ছাড়া এসব কথা কেউ বিশ্বাস করবে না।

হঠাৎ বিদ্যুতের ঝিলিক খেলে যায় র‍্যাফার্টির মাথায়। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসে বসার ঘরে।

'একটা কথা, মিস্টার অ্যালসপ্। ওদের কাছ থেকে কি ডিমের দাম পেয়েছেন?'

অ্যালসপ্-কর্তা তখনও চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে আলমারির মাথায় ক্যামেরা খুঁজে চলেছেন। র‍্যাফার্টির কথা শুনে নেমে দাঁড়ালেন মেঝেয়।

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। এসব ব্যাপারে ওরা খুবই ভদ্র।'

'দেখি তো ওদের পয়সাগুলো।' র‍্যাফার্টি পারলে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

'দূর, মশাই, পয়সা কোথায় দেখছেন? ছ-বছর আগে প্রথমবার ডিম নেওয়ার সময় দাম হিসেবে ওরা নিজেদের দেশের কটা ডিম দিয়েছিল আমাদের।'

'ছ-বছর আগেকার ডিম!' র‍্যাফার্টি বিষম খায়। 'কীসের ডিম?'

'তা কী করে বলব? তবে আমাদের এখানকার মতন গোলগাল নয়, ওদের ডিমগুলো দেখতে ছিল ঠিক নক্ষত্রের মতন। সেও কী আজকের কথা। দেখতে দেখতে ছ-বছর কেটে গেল—'

'তা, ডিমগুলোর কী হল শেষ পর্যন্ত?'

'দুটো ডিম ফুটে বাচ্চা বেরিয়েছিল। সে কী বদখৎ চেহারার প্রাণী—আপনাকে আর কী বলব! তবে হ্যাঁ, ছ-টা করে পা ছিল প্রত্যেকের। মহাকাশের বন্ধুদের কথা ভাবতে ভাবতে একদিন ওই পাখিদুটোকে কেটেকুটে রান্না করে খেয়ে ফেল্লাম—'

BanglaBook.org

র‍্যাফার্টির গলা দিয়ে স্বর বেরয় না। অ্যালসপের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলে, 'ওদের হাড়গোড়গুলো এখন কোথায় আছে, বলতে পারেন?'

'অ্যাঁ? আপনি ওদের হাড়গোড়ের হদিশ জানতে চাইছেন? সেগুলো তো আমরা খেতে দিয়েছিলাম আমাদের বাড়ির পোষা কুকুরটাকে। তা, সে কুকুরটাও তো মারা গেছে বছর কয়েক আগে।'

অ্যালসপ্-দম্পতিকে ধন্যবাদ জানিয়ে শূন্যদৃষ্টিতে বেসামাল পা ফেলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছিল র‍্যাফার্টি। সম্বিত ফিরল অ্যালাসপ্-কর্তার ডাকে।

'আরে ও মশাই, দাঁড়ান দাঁড়ান। এই এতক্ষণে খুঁজে পেলাম ক্যামেরাটা!'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

গুটি

ডিন্ কুন্‌জ্

বাবার শরীরটা এখন রীতিমতো ভারী—আমার আর রীনা'র পক্ষে টেনে আনতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল। মাংসপেশিগুলো জমাট বেঁধে যাওয়ার ফলে বাবার শরীরটা এখন যেন শক্ত ধাতুর পিণ্ড! আমাদের বাড়ির পেছন দিকের ঘাসজমিটায় বাবার শক্ত দেহটাকে টেনে এনেই হাঁপাতে হাঁপাতে রীনা বলল, 'ইস্, টন খানেক ওজন হবে!'

আমি বললাম, 'উঁহু, বাবার ওজন ছিল ঠিক সাড়ে চুয়াত্তর কিলো। কদিন আগেই তো দেখলাম।'

রীনা আমার চেয়ে বয়সে ছোট, অথচ আমার তুলনায় অনেক বেশি ধীর, স্থির, হিসেবি। ওর বুদ্ধিতেই বাবার শরীরটাকে বাড়ির এতগুলো ঘর টপকে বাইরের জমিতে এনে ফেলেছি। বললাম, 'কী করবে এবার এটাকে নিয়ে?'

'পুড়িয়ে ফেলব। বেশি দেরি করা যাবে না। শরীরটায় ইতিমধ্যেই জীবাণুরা বাসা বাঁধতে শুরু করেছে। এখানে ছ-ফুট গভীর কবর যে খুঁড়ব আমাদের সে শক্তি কই?'

'বেশ, তবে কাঠকুটো জোগাড় করে নিয়ে আসি।' বললাম আমি।

'উঁহু, চলো আরও একটু দূরে টেনে নিয়ে যাই। এত কাছে পোড়ালে বাড়িটায় আগুন লাগতে পারে!'

আমি হেসে বললাম, 'গোটা পৃথিবীটাই তো আমাদের দখলে। ইচ্ছে করলে, অন্য যে কোনো বাড়িতে গিয়েই তো থাকতে পারি।'

'তোমার এই বাড়িটাই আমার দারুণ পছন্দ।' বাড়ি ছাড়ার ব্যাপারে রীনা বিশেষ উৎসাহ দেখায় না।

বাগানে শুকনো ডালপালার অভাব ছিল না। সেগুলো পরপর সাজিয়ে চিতা জ্বালাতে বেশি সময় লাগে না। আগুনের শিখা লক্‌লক্ করে ওঠে, আগুনের মধ্যে বাবার শরীরটাকেও যেন আগুনের পিণ্ড বলে মনে হয়।

'আমার মনে হয়, এই সময় আমাদের মধ্যে একটু দুঃখের অনুভূতি জাগা উচিত।' আমি বাবার জ্বলন্ত শরীরটার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলাম। 'যতই হোক, লোকটা তো আমার বাবা ছিল।'

BanglaBook.org

আড়চোখে তাকায় রীনা। বলে, 'ওসব পুরনো সেন্টিমেন্ট কি আমাদের থাকা উচিত? আমরা মানুষের নতুন প্রজাতি। মানুষের সেই চিরাচরিত আবেগ-অনুভূতিগুলো তো আমাদের থাকার কথা নয়।'

'তা অবশ্য ঠিক।'

'এবারে তোমার মাকে বয়ে নিয়ে আসতে হবে। তারপর আমাদের বাড়িতে গিয়ে আমার বাবা-মায়েরও ব্যবস্থা করতে হবে।' আবেগহীন গলায় বলল রীনা। আগেই বলেছি, ওর স্বভাব ধীর-স্থির; কোন্ সময়ে কী করতে হবে তার নিখুঁত হিসেব থাকে ওর কাছে।

রীনার পেছন পেছন বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম আবার।

সদর থানা থেকে জনা ছয়েক পুলিশ পাঠানো হয়েছিল আমাদের ওপর নজর রাখার জন্য। আমাদের বাবা-মায়ের অস্বাভাবিক মৃত্যুর খবরটা ওদের কাছে কেউ হয়তো পৌঁছে দিয়েছিল। মৃত্যুর তদন্ত চটপট সেরে ফেলার ব্যাপারে ওদের আগ্রহ ছিল। সুতরাং আমাদের বাবা-মাদের পুড়িয়ে ফেলার দিন তিনেক পর আবার ছ-ছখানা চিতা সাজাতে হল সেই একই ঘাসজমিতে।

'আমাদের বোধহয় একটু ভুল হয়ে গেল। লোকগুলোকে না মেরে ফেললেও হয়তো চলত।' বললাম আমি।

'তুমি একেবারে বুদ্ধুই রয়ে গেলে!' বিরক্তির সঙ্গে জবাব দেয় রীনা। 'আমরা হলাম নতুন প্রজাতির মানুষ; বিবর্তনের ধারায় পুরনো মানুষদের থেকে আমাদের জন্ম হলেও—ওদের তুলনায় মানসিক শক্তিতে অনেক বেশি বলীয়ান। কিন্তু শারীরিক শক্তির ঘাটতি নেই ওদের। আমাদের ওপর অতর্কিতে যাতে সেই শক্তির ব্যবহার ওরা করতে না পারে সেজন্যই তো সব কটাকে খতম করতে হল।'

'কিন্তু এতগুলো লোককে পোড়ানোটাও তো কম হাঙ্গামার ব্যাপার নয়।' আগুনের দিকে তাকিয়ে বললাম আমি।

'তা বলে, পচা শরীরগুলো আমাদের পরিবেশকে দূষিত করবে—তাও হয় না।' রীনার সাফ জবাব।

......চিতার আগুনগুলো নিভে গেছে অনেকক্ষণ। জমির পোড়া অংশগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রীনা বলে উঠল, 'অল্পদিনের মধ্যেই পৃথিবী প্রায় জনশূন্য হয়ে যাবে। আশা করি প্রত্যেকটা মানুষের জন্য আমাদের আলাদা আলাদা করে চিতা সাজাতে হবে না।'

রীনা জোর দিয়ে কথাটা বললেও আমার কেন জানি না, অস্বস্তি হচ্ছিল। এটা ঠিক, আমরা মানে আমি আর রীনা হলাম মানুষের উন্নততর সংস্করণ;

BanglaBook.org

বিবর্তনের পথে মানুষের পরের ধাপ। আমার মনে পড়ে—মানুষরা একসময় নিয়েনডার্থালদের নাম দিয়েছিল 'প্রাক-মানুষ'; সেক্ষেত্রে আমরা নিশ্চয়ই 'উত্তর-মানুষ'। আমাদের মানসিক ক্ষমতা সীমাহীন। শুধুমাত্র 'ইচ্ছা'র জোরে আমরা যে কোনো প্রাণীকে মেরে ফেলতে পারি। যে কোনো মানুষের চিন্তা-ভাবনা আমাদের জানতে পারার ক্ষমতা রয়েছে। সুতরাং কারও পক্ষে আমাদের ক্ষতি করা অসম্ভব। তাছাড়া সে প্রশ্ন ওঠেও না, কারণ একটু আগেই আমি আর রীনা চেয়েছি—পৃথিবীর সমস্ত পুরনো মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক! আমাদের নিরাপত্তার জন্য এ ব্যবস্থা না নিয়েও উপায় ছিল না। একদিন না একদিন মানুষ আমাদের বিশেষ ক্ষমতাগুলোর কথা জানতে পেরে যেতই। কিন্তু তবু আমার মনে হয়, ব্যাপারটা বোধহয় ঠিক হল না। এভাবে সমস্ত মানুষ-জাতটাকে শেষ করে দেওয়া.....

'পুরনো ধারণাগুলো ছাড়ো।' রীনা আমার মনের কথা টের পায়। 'অভিব্যক্তির নিয়মই হল জীবের নতুন প্রজাতির জন্য জায়গা ছেড়ে পুরনো প্রজাতি লুপ্ত হয়ে যাবে। নিয়েনডার্থালরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল বলে কি মানুষ কখনও দুঃখ করেছে? ভুলে যাচ্ছ কেন—পৃথিবীর নানা প্রান্তে তোমার আমার মতো বেশ কিছু মানুষ জন্ম নিয়েছে—নতুন ধরনের আবেগ, নতুন ধরনের নিয়ম চালু করবে বলে। উন্নততর মানুষের সভ্যতা শুরু হতে চলেছে পৃথিবীতে।'

'ঠিকই তো।' রীনার কথায় সায় দিলাম এবার।

পৃথিবীতে পুরনো মানবসভ্যতা ধ্বংসের পর বেশ কয়েকবছর কেটে গেছে। একদিন রীনাকে বললাম, 'চলো, এবারে এই পুরনো বাড়ি ছেড়ে আমরা নতুন কোথাও যাই, আমাদের মতো নতুন প্রজাতির আরও মানুষকে খুঁজে বের করি।'

রীনা অমনি বলে উঠল, 'উঁহু, এ জায়গা ছেড়ে আমি কোথাও নড়ছি না। এখানেই আমাদের সন্তান জন্ম নেবে।'

আমি আর কথা বাড়ালাম না।

রীনার গর্ভে যে শিশু বড় হচ্ছে, তার অস্তিত্ব আমাদের ষষ্ঠেন্দ্রিয়ে ধরা পড়ল মাস চারেক পর। রীনা বলল, 'বাচ্চাটা নিশ্চয়ই ছেলে-ই হবে। বুঝতে পারছ—পৃথিবীর জল-হাওয়ায় বেরিয়ে আসতে এখনও ওর দেরি থাকলেও, এখনই আমাদের অস্তিত্ব টের পাচ্ছে? আমি ঠিক জানি—মানসিক চেতনা দিয়ে আমাদের দেখছে, আমাদের কথা শুনছে ও।'

BanglaBook.org

আমারও তাই মনে হচ্ছিল। শুধু একটা বিষয়ে খটকা ছিল। বাচ্চাটাও তো আমাদের দেখছে-শুনছে, হয়তো আমাদের মনের কথাও জানছে,—কিন্তু আমি তো চেষ্টা করেও ওর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানতে পারিনি। তবে কি ও আমাদের চেয়েও উন্নততর প্রজাতির মানুষ? আমার এই সংশয়ের কথাটা অবশ্য মুখে বলতে হল না। রীনা চেঁচিয়ে উঠল, 'কক্ষনো না। ওই ছেলে আমাদের চেয়ে উন্নততর প্রজাতির মানুষ হতেই পারে না।'

'কিন্তু আমাদের দুজনের কেউই কিন্তু ওর মনের কথা টের পাচ্ছি না।' আমি বললাম।

'তা হোক, বিবর্তনের ধাপগুলো এত তাড়াতাড়ি পাল্টে যায় না। ও নিশ্চয়ই আমাদের মতই হবে।'

আমি হাসলাম। রীনা মুখে যাই বলুক, পুরনো প্রজাতির আবেগ-অনুভূতিগুলোকে নিজেও পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেনি। মুখে বললাম, 'আমাদের বাবা-মাও ভেবেছিল, আমরা তাদের মতই হব। আজ ওরা কোথায়?'

'ও কি আমাদের মেরে ফেলবে?' রীনাকে চিন্তিত দেখায়।

'জানি না। সত্যিই জানি না।' বিড়বিড় করে বলে উঠি আমি।

মাঝরাতে ধাক্কা দিয়ে আমায় ঘুম থেকে তুলে রীনা বলে, 'তখন ভুল হয়েছিল। বাচ্চাটা ছেলে নয়, মেয়ে।'

ঘুম-জড়ানো গলায় বলি, 'কী ব্যাপার বল তো—একবার মনে হচ্ছে ছেলে, একবার মনে হচ্ছে মেয়ে?'

হঠাৎ আমাদের দুজনের মাথায় একসঙ্গে যে বিদ্যুৎ খেলে যায়। আমরা দুজনে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠি, 'বাচ্চাটা ছেলেও বটে, মেয়েও বটে। ও আসলে উভলিঙ্গ!'

আমরা দুজনেই দুজনের দিকে হতাশ দৃষ্টিতে তাকাই।

'গুটিপোকার জীবনচক্রটা ভাবো একবার।' আমি আস্তে আস্তে বলে উঠি। 'গুটিপোকারা তাদের চারপাশে রেশম-গুটি বোনে নিজেদের অবস্থার রূপান্তরের উদ্দেশ্যে। একসময় যখন তারা গুটি ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে, তখন তারা আর গুটিপোকা নয়—মথ। নতুন প্রজাতির যে শিশু পৃথিবীতে আসছে তার সঙ্গে মথের তুলনা করতে পারো। আমাদের আগের প্রজাতির মানুষকে যদি গুটিপোকা বলে ধরে নাও, তবে আমাদের শিশু সেই মানুষের পরবর্তী প্রজাতি। গুটিপোকা আর মথের মাঝখানের রেশমগুটিটা হলাম আমরা।

BanglaBook.org

'আমরা তো ওকে মেরে ফেলতে পারি।' রীনা যেন মনকে আশ্বাস দিতে চায়। আমি কিন্তু জানি—সেটা আর সম্ভব নয়। হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও অনাগত শিশুটির প্রকৃতি জানতে পারিনি আমরা। যে কোনো শক্তির বিরুদ্ধে নিজেকে ও রক্ষা করতে যে পারবে—সে ব্যাপারে কোনো সংশয় থাকে না আমার।

....পৃথিবীতে নতুন প্রজাতির মানুষ আসছে। আর মাত্র কয়েকমাস পরেই আমাদের ছুটি। মথ-এর কাছে ছেড়ে আসা রেশমগুটির কী কোনো প্রয়োজন থাকে?

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ছদ্মবেশ

আব্রাম ডেভিডসন

রাস্তাটা অপরিষ্কার থাকে প্রায় সব সময়েই তেল-কালি-ঝুল-মাখা সাইকেলের দোকানটা রাস্তাটার সঙ্গে একেবারে মানানসই হয়েছে, বলতে হবে। সবাই জানে, ওটা ফার্ড আর অস্কারের দোকান। দুজনে গলায় গলায় বন্ধু, সাইকেল সারাইয়ের নামে দুজনেই সমান চৌকস, কিন্তু স্বভাবচরিত্রে দুজনের মধ্যে মিল নেই একরত্তি! অস্কার হাসিখুশি, গলা চড়িয়ে কথা বলে সবসময়। সাইকেল মেরামতের জন্য একবার কেউ দোকানে এলেই ওর বন্ধু বনে যায়। ফার্ড কথা বলে কম, কারোর কোনো সমস্যার কথা উঠলেই উদ্বেগে ছটফট করতে থাকে!

দোকানটা থেকে মন্দ আয় হয় না দুজনের। শুধু সাইকেল মেরামত নয়, সেই সঙ্গে সামনের বড় পার্কটায় যারা বেড়াতে আসে, তাদের কাছে ঘণ্টা হিসেবে সাইকেল ভাড়া খাটানোরও ব্যবস্থা আছে। অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা সাইকেল ভাড়া নিতে দোকানে এলেই অস্কারের আর কাজে মন বসে না। হাতুড়ি, স্ক্রু-ড্রাইভার নামিয়ে রেখে দিব্যি তাদের সঙ্গে গল্পে মেতে যায়। কখনও বা গল্প করতে করতে চলে আসে পার্কে; চাই কী, কাউকে কাউকে সাইকেল চালানো শেখাতেও লেগে পড়ে!

'শুনছেন?'

ফার্ড কাজ করতে করতে আড়চোখে তাকায়। মাঝবয়সী এক মহিলা এসে দাঁড়িয়েছেন দোকানের সামনে। পাশেই প্যারাম্বুলেটারে বসে মোটাসোটা একটা বাচ্চা, এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে।

'একটা সেফটিপিন হবে এখানে?' ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করেন।' আমার বাচ্চার ইজেরটা খুলে গেছে—'

হাতের রেন্‌জ্‌-টা নামিয়ে রেখে ঘরের কোণে টেবিলের ড্রয়ার হাতড়ায় ফার্ড। ড্রয়ারটার মধ্যে দু-তিনটে সেফটিপিন ও নিজে রেখেছিল। এখন কিন্তু একটারও দেখা মিলল না।

'সত্যি, কাজের সময় যদি একটা জিনিসও পাওয়া যায়!' ফার্ড বিড়বিড় করতে থাকে। ভদ্রমহিলাও আর অপেক্ষা না করে প্যারাম্বুলেটার ঠেলতে শুরু করেন।

BanglaBook.org

দুপুরবেলা সাধারণত দোকানঘরেই লাঞ্চ সেরে নেয় দু-বন্ধুতে। সেদিন খেতে বসে সেফটিপিনের প্রসঙ্গটা তুলল ফার্ড।

'ড্রয়ারের মধ্যে কয়েকটা সেফটিপিন রাখা ছিল, তুই দেখেছিলি?'

'হ্যাঁ, দেখেছিলাম মনে হচ্ছে।' অস্কার অন্যমনস্কভাবে জবাব দেয়।

'কোথায় যে গেল? এক ভদ্রমহিলা একটা সেফটিপিনের খোঁজ করছিলেন। দিতে পারলাম না। বাচ্চাটার ইজের খুলে গেছে— বেশ অসুবিধেয় পড়েছিলেন উনি।'

'থামো তো,' অস্কার বিরক্ত মুখে বলে ওঠে, 'এই রাস্তাতেই এক গন্ডা দোকান আছে যেখানে সেফটিপিন কিনতে পাওয়া যায়।'

'কিন্তু ড্রয়ারে রাখা সেফটিপিন কেন পাওয়া যাবে না?' ফার্ড বিড়বিড় করতে থাকে।

অস্কার উঠে দাঁড়ায় বলে, 'ওসব কথা থাক। লাল রঙের যে সাইকেলটা অ্যাক্সিডেন্টের পর মেরামতির জন্য এসেছে—ওটার কাজে কি হাত দিবি আজ?'

'দেখা যাক।' নিরাসক্ত গলায় জবাব দেয় ফার্ড।

ফার্ডের শখ—চারপাশের গাছপালা, পোকামাকড়, জীবজন্তুদের খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করা। একদিন একটা গিরগিটির ছানা ধরে কাচের শিশি-র মধ্যে পুরে ফেলেছিল কেমনভাবে গিরগিটির গায়ের রং পাল্টায় তা কাছ থেকে দেখাই ছিল উদ্দেশ্য।

'জন্তুজানোয়ারদের ছদ্মবেশের কথা শুনেছিস?' গিরগিটি-সুদ্দু কাচের শিশিটা নাড়াতে নাড়াতে বলে উঠেছিল ফার্ড।

'কাল টিভিতে একজন চার্লি চ্যাপলিন সেজে এসেছিল; তা, জন্তুজানোয়াররাও ছদ্মবেশ ধরে নাকি?'

'শুধু কি জন্তুজানোয়ার? পোকামাকড়টাই বা কম কীসে?' ফার্ড বন্ধুকে বোঝাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে? 'যেমন ধর একটা ফড়িং গাছের পাতায় এমনভাবে বসবে—দেখে মনে হবে যেন ওটা গাছেরই আর একটা পাতা! তারপর যেই না কোনো পোকা কাছে এল, অমনি টুপ করে গিলে ফেলবে তাকে। এদিকে গাছের পাতার সঙ্গে মিশে থাকার ফলে পাখিদের হাত থেকেও বাঁচোয়া।'

'তুই বলছিস, ওরা নিজেদের চেহারাটা পুরো পাল্টে নিতে পারে?' অস্কারের যেন বিশ্বাস হয় না।

'তিন সত্যি করে বলছি, আমি নিজে দেখেছি।' ফার্ড নিজেকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার চেষ্টা করে। 'জানিস, দক্ষিণ আমেরিকায় একধরনের কচ্ছপ পাওয়া যায় যাদের চেহারা অবিকল পাথরের চাঁই-এর মতন। পাথর ভেবে মাছেরা

BanglaBook.org

যেই কাছে আসে, অমনি গিয়ে পড়ে সেই কচ্ছপের খপ্পরে! কিম্বা ধর, সুমাত্রার সেই মাকড়শার কথা, পেট উল্টে পড়ে থাকলে যাদের চেহারা হয় অবিকল পড়ন্ত পাখির মতন। ওই অবস্থায় ওরা প্রজাপতি ধরে খায়!'

অস্কার হাসছিল হোঃ হোঃ হোঃ করে। কোনো মজার কথা মনে পড়েছে হয়তো। ফার্ড ওর দিকে আড়চোখে তাকায়।

'অ্যাই, আমার পেন্সিলটা কোথায় রাখলাম বলতো?' ফার্ড এ-পকেট, সে-পকেট হাতড়ায়।

অস্কার বলে, 'তুই সেদিন বলেছিলি—ড্রয়ারের মধ্যে সেফটিপিন রেখে আর পাসনি। এখন একবার খুলে দ্যাখ, ড্রয়ারে কত সেফটিপিন!'

ফার্ড হাঁ করে অস্কারের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। আর ঠিক সেইসময় দরজার ওপাশ থেকে কে যেন হাঁক দেয়।

'এক্ষুনি আসছি, একটু দাঁড়াও।' অস্কার ঘরের ভেতর থেকে চেঁচিয়ে ওঠে।

অস্কার দেখে, দরজার গায় সাইকেলটাকে হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে প্যান্টের পকেটে হাত ঢোকাচ্ছে এক কিশোর। ওর মুখটা চেনা-চেনা। অস্কারের সঙ্গে মাঝে মাঝে পার্কে আড্ডা দেয়। আজও নিশ্চয়ই সেই উদ্দেশ্যেই এসেছে।

'ফার্ড-রে, এই যাব আর আসব। তুই ততক্ষণে ওই সাইকেলটার ব্রেক-শুটা পাল্টে ফ্যাল্।' বলেই একলাফে দরজার বাইরে গিয়ে দাঁড়ায় অস্কার। ফার্ড জানে, সন্ধে পেরনোর আগে আজ আর টিকি দেখা যাবে না ওর।

সন্ধের আগেই অবশ্য শিস্ দিতে দিতে ফিরে এল অস্কার। ফার্ডকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'অনেকদিন পর আজ একটা সিনেমা দেখলাম জানিস?'

ফার্ড গম্ভীর মুখে অস্কারের সাইকেলটাকে ভেতরে ঢুকিয়ে নিল; তারপর অস্কারকে একেবারে হকচকিয়ে দিয়ে হাতুড়ির এক ঘা কষিয়ে দিল সাইকেলের রডে!

'তুই কি পাগল হয়ে গেলি?' ফার্ডকে থামানোর চেষ্টা করে অস্কার।

ফার্ডের গায় তখন অসুরের শক্তি। টেনে টেনে চাকার স্পোকগুলোকে খুঁচিতে থাকে ও।

'তুমি শুধু পাগল নও, হিংসুটেও বটে।' অস্কার তেতো গলায় বলে ওঠে। 'ইচ্ছে করলে নিজেও তো গিয়ে ফূর্তি করতে পারো। তা তোমার তো ওসব ভালো লাগে না!'

সাইকেলটা ফেলে রেগে উঠে দাঁড়ায় ফার্ড। কেমন যেন অবসন্ন দেখাচ্ছে ওকে। টুপিটা তুলে নিয়ে ক্লান্ত পায়ে বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকে।

BanglaBook.org

এরপর পাক্কা দুদিন দুজনের মধ্যে কথা বন্ধ! তৃতীয় দিন অস্কারই এসে ফার্ডের পিঠে হাত রাখে। বলে, 'সেদিন রাগের মাথায় আমার সাইকেলটার তো বারোটা বাজালি! আয়, দুজনে মিলে ওটাকে এবার সারিয়ে ফেলি।'

এক গাদা সাইকেলের মধ্যে থেকে অস্কারের সাইকেলটাকে টেনে বের করে ফার্ড। অস্কার বলে, 'আশ্চর্য ব্যাপার! দোমড়ানো সাইকেলটাকে মেরামত করলি কখন? এটাকে এত চকচকেই বা দেখাচ্ছে কেন?'

'রিজেনারেশন—পুনর্জন্ম!' বিড়বিড় করে বলে ওঠে ফার্ড। 'টিকটিকির ল্যাজ ছুঁয়ে দেখেছিস কখনও?'

'মানে?' ফার্ডের মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে অস্কার।

টিকটিকির ল্যাজ ছুঁলেই দেখবি, ওটা কেমন খসে যায়। কদিন পরেই আবার নতুন ল্যাজ গজায়। এক ধরনের কেঁচো আছে জানিস—যাদের দু-আধখানা করে কেটে ফেললেও সেগুলো মরে না। প্রত্যেকটা অংশ থেকে নতুন কেঁচো জন্মায়! ব্যাঙেদের ঠ্যাঙ কেটে ফেললেও নতুন ঠ্যাঙ গজায়—'

'বেশ, তা না হয় হল,' অস্কার বলে ওঠে, 'এবার বলত—পুরনো সাইকেলটাকে এমন চকচকে করলি কী দিয়ে?'

'সাইকেলটা আমি ছুঁয়েও দেখিনি।'

'কী বলছিস? এর স্পোকগুলো সব টেনে টেনে খুলে ফেললি—তা আপনা থেকেই আবার সব সোজা হয়ে গেল, বলতে চাস?'

'ওটা আসলে সাইকেলই নয়!' স্থির কণ্ঠে বলে ওঠে ফার্ড।

অস্কার বেশ বিচলিত বোধ করে। বলে, 'তুই যে পুনর্জন্মের কথা বললি—ধরে নিলাম, সবই ঠিক। কিন্তু ব্যাপারটা তো শুধু জ্যান্ত প্রাণীর ক্ষেত্রেই খাটে, তাই না? সাইকেল তো আর জ্যান্ত নয়।'

ফার্ড আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে। বলে, 'একটা ভাঙা ক্রিস্টাল কিম্বা পাথরের টুকরো আপনা থেকেই অন্য আকার নিতে পারে, যদি পরিবেশটা ঠিকমতো পায়। তুই বলছিলি না, ড্রয়ারের মধ্যে অনেকগুলো সেফটিপিন দেখেছিস? একবার দ্যাখ তো, ওগুলো এখনও আছে কিনা।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও টেবিলের দিকে এগিয়ে যায় অস্কার। তারপর ড্রয়ারটা খুলেই চেঁচিয়ে ওঠে, 'নেই তো! আশ্চর্য, একটু আগেও দেখেছি, সব উবে গেল কী করে?'

অস্কারের কথা শেষ হতে না হতেই আলমারিটা একটানে খুলে দিয়ে ফার্ড বলে, 'দেখেছিস, আলমারি ভর্তি হ্যাঙ্গার! ওগুলো কি আগে ছিল, বল?'

BanglaBook.org

অস্কার কাঁধ ঝাঁকায়। বলে, ‘আচ্ছা এমন তো হতে পারে, তুই কিম্বা আমি অন্যমনস্কভাবে সেফটিপিনগুলো অন্য কোথাও সরিয়ে রেখেছি, কিম্বা হ্যাঙ্গারগুলিকে রেখে দিয়েছি আলমারিতে?’

ফার্ডের দুচোখে একরাশ আতঙ্ক। অস্কারের হাত দুটো জাপটে ধরে বলে, ‘আমার বড় ভয় করছে রে! তোকে বলেছিলাম না, পোকামাকড়-জন্তুজানোয়াররা কেমন করে ছদ্মবেশ ধরে? আচ্ছা, এমন তো হতে পারে—ওইসব সেফটিপিন, হ্যাঙ্গার—ওগুলো আসলে সব ছদ্মবেশ। আবার এমনও হতে পারে—শৈশবে যাদের আকার সেফটিপিনের মতো, বড় হয়ে সেগুলিই হ্যাঙ্গারের চেহারা নেয়। প্রজাপতির ক্ষেত্রে তো দেখেছিস—প্রথমে শুককীট, পরে শুঁয়োপোকা। আমি বলছি অস্কার, আমরা ওগুলোকে যতটা নিরীহ ভাবছি, ওগুলো ততটা নিরীহ নয়; ওরা সবাই শিকারের আশায় বসে আছে। দূর করে দে, ওগুলোকে দূর করে দে—’

আতঙ্কে চিৎকার করতে থাকে ফার্ড। ওর কাঁধ দুটো ঝাঁকিয়ে দিয়ে অস্কার বলে, ‘কী সব বলছিস পাগলের মতো? আজ যেটাকে দেখছি সেফটিপিন, কাল সেটাই হয়ে যাবে হ্যাঙ্গার?’

‘ঠিক তাই! আজ যেটাকে দেখছ গুটিপোকা—কাল সেটাই হবে মথ; আজ দেখছ ডিম—কাল ওটা থেকেই মুরগির ছানা বেরবে। তফাত শুধু একটাই—অন্যগুলোর রূপান্তর আমাদের চোখের সামনে ঘটে। আর এদের রূপান্তরটা হয় আমাদের অগোচরে।’

‘ফার্ড, ফার্ড, ভাই আমার,’ অস্কারকে অসহায় দেখায়, ‘তোর শরীরটা খারাপ হয়েছে। আয়, আজ দোকানে ঝাঁপ ফেলে বাড়ি যাই। তুই কদিন বিশ্রাম নে—আমার সাইকেলে করেহঅস্ক্ম তোকে পৌঁছে দেব, চল।’

ফার্ড ইতস্তত করে। তারপর অস্কারের পীড়াপীড়িতে সাইকেলে চাপতেই গড়িয়ে পড়ে যায় রাস্তায়।

‘দেখলি, আমায় কেমন ছুঁড়ে ফেলে দিল?’ সাইকেলের দিকে বিতৃষ্ণ নয়নে তাকায় ফার্ড। বলে,’ ‘তোকে বলছি—ও নির্ঘাত আমাকে খুন করতে চায়—আমি ওর রহস্য ধরে ফেলেছি কিনা।’

কথাটা বলেই রাস্তা ধরে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে থাকে ফার্ড।

মিস্টার হোয়াটনে-কে এতসব কথা অবশ্য বলেনি অস্কার। শুধু বলেছে, ‘আমি এখন একাই ব্যবসা দেখছি! যা কিছু মেরামতের কাজ, সব একাই সামলাতে হয়!’

BanglaBOOK.org

মিস্টার হোয়াটনে আজ অনেকদিন পর এসেছেন। একসময় যখন এ পাড়ায় থাকতেন, তখন এই দোকানে নিয়মিত যাতায়াত ছিল ওঁর।

'আমি এবারে বিয়ে করব, ঠিক করেছি।' হাতের তেলকালি মুছতে মুছতে বলে অস্কার।

'আপনাকে আগাম অভিনন্দন।' হোয়াটনে দরাজ গলায় বলেন। 'চলুন না পাশের রেস্তোরাঁয় বসে একটু কফি খাওয়া যাক।'

কফি খেতে খেতে হোয়াটনে তাঁর নতুন বাসস্থান, ছেলে-মেয়ে-বৌ-এর গল্প করেন। তারপর এক সময় হঠাৎ চিৎকার করে বলে ওঠেন, 'আপনার পার্টনারের কিন্তু কাজে-কর্মে দারুণ মন ছিল। কোনোদিন কাজ ফেলে বাইরে যেতে দেখিনি! তা, হঠাৎ কী হল যে বাইসাইকেলে বিতৃষ্ণা এসে গেছে ওর?'

'সবই ঠিক ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী যে হল ওঁর!' মাথা নিচু করে বলতে থাকে অস্কার। 'কী যেন একটা ভয় ওকে ঘিরে থাকত সবসময়। তারপর একদিন সকালে একটু দেরি করে দোকানে এসে দেখি—কোটের হ্যাঙ্গার গলায় পেঁচিয়ে মরে পড়ে আছে ও!'

অস্কারের চোখের কোণটা জলে চিকচিক করে।

'বেচারা!' বলেই বেয়ারাকে বিলটা আনার জন্য হাঁকডাক শুরু করেন হোয়াটনে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ছোট্ট মেয়ে অ্যান

উর্সুলা কে লেগুইন

ওর আসল নাম 'অ্যান'; বাবা ডাকতেন 'জুয়েল অ্যান' বলে। বছর ছয়েক বয়স অবধি বাবার কাছ থেকে অঢেল আদর পেয়েছিল ও।

ওর জন্মের দিনটার কথা আমার স্পষ্ট মনে পড়ে। আমার বয়স তখন ছ'বছর। মা যখন হাসপাতাল থেকে ওকে নিয়ে ফিরল, বাবার চোখেমুখে যেন খুশি ধরে না! আমারও আনন্দ কিছু কম হয়নি। সবসময় ওর পাশে পাশে ঘুরঘুর করতাম; ওর কাঁথা পাল্টানো, জামাকাপড় ছাড়ানো, গায়ে পাউডার দেওয়া— এসব কাজে আগ বাড়িয়ে মাকে সাহায্য করতাম। অ্যান ওর জীবনের প্রথম হাসিটা হেসেছিল মা আর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে; এবং সেজন্য আমার বেশ অহঙ্কারও ছিল। মা যখন দোকান-বাজারে যেত, অ্যানকে প্যারাম্বুলেটরে চাপিয়ে আমিও হাঁটতাম। তারপর যেই ও একটু বড় হল, আমার হাত ধরে হাঁটতে শিখল, মায়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও দোকানে ঢুকতে শুরু করলাম। কিছুদিন যেতে না যেতেই অ্যান তড়তড়িয়ে বেড়ে উঠে লম্বায় আমায় ছুঁয়ে ফেলল। আমাদের নতুন খেলা শুরু হল তখন। আমাদের ঘরকন্নার খেলায় অ্যান হত 'মিসেস গুপী' আর আমি সাজতাম 'মিসেস বুপী'; গরমের ছুটির দুপুরে আমাদের খেলা জমত বাড়ির পেছনের বাগানে। সে সময় আমাদের তখন সঙ্গীসাথীও তেমন ছিল না। আমার থেকে দু'বছরের বড় দাদা ডুয়ান আমাদের সঙ্গ সযত্নে এড়িয়ে চলত। কে জানে কেন, অ্যানের চটপট বেড়ে ওঠাটা ওর একেবারেই পছন্দ হয়নি। আর পাঁচজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা না থাকায় আমাদের দু'বোনের মধ্যে ভালবাসার এক গাঢ় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। শরীরের মাপে সমান সমান হয়ে যাবার দরুনই বোধহয় অ্যানকে নিজের সমবয়সী ভাবতে শুরু করেছিলাম আমি।

পাঁচবছর বয়সে অ্যান প্রথম স্কুলে গেল আমারই হাত ধরে। ক্লাস ঘরে ঢুকতেই দিদিমণি বলেছিলেন, 'আরে, তুমি তো দেখছি দারুণ ঢ্যাঙা!' দিদিমণির ওই কথা কটার মধ্যে কেমন যেন একটা বিদ্রুপের গন্ধ ছিল। আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'সত্যিই কি তোমার বোনের বয়স পাঁচ বছর?'

BanglaBook.org

'আজ্ঞে, হ্যাঁ—' লজ্জায় আমার কানটা লাল হয়ে গিয়েছিল।

'পাঁচবছরের পক্ষে ওর চেহারাটা বেশ বেমানান বলে মনে হয় না? 'ভদ্রমহিলা কেমন বিচ্ছিরিভাবে আমার দিকে তাকিয়েছিলেন—'ভাবছি, ওর জন্য ক্লাসের বাকি ছেলেমেয়েদের আবার অসুবিধে না হয়—'

সেই সময় অ্যান হঠাৎ বলে উঠেছিল, 'সামনের জানুয়ারিতে আমার ছয় পূর্ণ হবে।'

'ঠিক আছে। ঠিক আছে।' শিক্ষিকা মহিলাটি ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠেছিলেন। 'যাও একদম পেছনের বেঞ্চিতে গিয়ে বসো।'

জুয়েল অ্যান গিয়ে সবার পেছনে বসল। দেখলাম, বসে থাকা অবস্থাতেই ওর মাথাটা দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেমেয়েদের মাথাগুলিকে প্রায় ছাড়াতে চলেছে! ও যে স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি লম্বা—তা সেদিনই সত্যিকারের টের পেয়েছিলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে আমার খেয়াল হয়েছিল—বাবা ওকে অনেক আগেই 'মা-বুড়ি' বলে আদর করা বন্ধ করেছেন।

মনে আছে, এরপরই বাবা একদিন মাকে বলেছিলেন, অ্যানকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যেতে। ওর অমন তড়তড়িয়ে বেড়ে ওঠার ব্যাপারটা বাবার কাছে যেন সুবিধের ঠেকছিল না। মা অবশ্য খানিকটা নিমরাজি হয়েই ডাক্তারের কাছে অ্যানকে নিয়ে গিয়েছিল এবং তিনিও ওকে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর হর্মোন জাতীয় কীসব ওষুধ খেতে দিয়েছিলেন। তা, সেসব ওষুধ দু-চারদিন খাবার পর অ্যানের যেই মাথা ধরা আর ঘুম ঘুম ভাব শুরু হল অমনি মা ওষুধগুলো টপাটপ আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিল। মার ধারণা হয়েছিল, ওইসব হর্মোন-টর্মোন শরীরে গেলে অ্যানের গালে দাড়ি গজাবে কিংবা গলার স্বর ভেঙে যাবে! আমার বিশ্বাস—ওষুধ ফেলে দেওয়ার ওই ঘটনাটা বাবার অজানা ছিল। ফলে, বেশ কিছুদিন পরেও যখন অ্যানের অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটল না—পুরো ব্যাপারটা সম্পর্কে বাবা কেমন উদাসীন হয়ে গেলেন। অন্য কোনো ডাক্তারের কাছে যাওয়ার কথা বললেন না আর।

স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর প্রথম দু'টো বছর জুয়েল অ্যানের মোটামুটি ভালোই কেটেছিল, বলতে হবে। পড়াশুনোর ব্যাপারে ওর গাফিলতি ছিল না। স্কুল কামাই করত না একদিনও। ক্লাস থ্রি-তে উঠতেই ওকে মনিটর বানিয়ে দিতেন দিদিমণিরা। ও তো দারুণ খুশি! সে বছরেই আবার ছবি-আঁকা প্রতিযোগিতায় যখন পুরস্কার পেল—ওর আহ্লাদ আর ধরে না! ওর আচরণেও সকলে খুব সন্তুষ্ট ছিল; তাহলেও, স্রেফ বেঢপ চেহারার জন্যই পরের বছর স্কুলের খাতা থেকে ওর নাম কাটা গেল। ব্যস্, জুয়েল অ্যানে-এর স্কুল জীবনের ওখানেই ইতি।

BanglaBook.org

স্কুলে যেতে না পারার দরুন জুয়েল অ্যান যে ভেঙে পড়েছিল তা নয়; তবে ও যেন আগের চেয়ে বেশি চুপচাপ হয়ে গেল।

বাড়ির সকলেরই ওর প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল, একমাত্র ডুয়ান-ই ছিল যা কিছু ব্যতিক্রম। ঘাড় উঁচু করে আট বছরের ছোট বোনের মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে ও নিশ্চয়ই হীনমন্যতায় ভুগত। ডুয়ানের সঙ্গে আমারও যে খুব একটা বনত তা নয়। ঝগড়ুটে স্বভাবের জন্য বাবার কাছে প্রায়ই পিটুনি খেত ও। শেষ পর্যন্ত, ষোল বছর বয়সে একদিন বাড়ি ছেড়ে পালাল। তারপর বহুদিন কোনো খোঁজ-খবর নেই; শেষে একদিন মায়ের নামে একটা চিঠি এলো অ্যাটলান্টা থেকে। অস্পষ্ট হরফে ডুয়ান লিখেছে, ওর এক বন্ধু নাকি পৃথিবীর সব বিচিত্র জন্তু-জানোয়ারদের নিয়ে ছবি তোলে; বাবা-মা যদি চায় তবে জুয়েল অ্যান-কে নিয়েও একটা ছবি তোলানো যেতে পারে। পোস্টকার্ডের পেছনে কোনো ঠিকানা ছিল না। ঠিকানা থাকলেও ডুয়ানের প্রস্তাবে সায় দিয়ে বাবা-মা ওকে উত্তর দিতেন কি না সন্দেহ। মা অবশ্য চিঠি পাওয়ার পর দু-একদিন কান্নাকাটি করেছিল, তবে তার পেছনে ডুয়ানকে হারানোর শোক যত না ছিল, তার চেয়েও বেশি ছিল ডুয়ানের ছোটবেলার স্মৃতিগুলিকে বয়ে বেড়ানোর দুঃখ। ডুয়ানের কাছ থেকে এরপর কোনোদিন কোনও চিঠিপত্র আসেনি আর।

স্কুল ছাড়ার পর অ্যানকে বাড়িতে রেখে পড়ানোর ব্যাপারে বাবা-মা দুজনেরই প্রথম প্রথম বেশ উৎসাহ ছিল। স্কুল থেকে কিছু বইটইও বাড়িতে নিয়ে এসেছিলাম আমি। কিছুদিন পরেই অবশ্য বাবার উৎসাহে ভাঁটা পড়ল। বাবা বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন—জুয়েল অ্যানের ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই! ইতিমধ্যে ওর নিজস্ব ঘরে আর কুলোচ্ছিল না বলে বাড়ির লাগোয়া গ্যারেজের ছাদ ভেঙে এক পেল্লায় উঁচু হলঘর তৈরি হল ওর থাকার জন্য; বাড়ির বাইরে থেকে সে ঘরে ঢোকার দরজাটা বানানো হল দু'মানুষ সমান উঁচু করে; তাতেও অ্যানকে কুঁজো হয়ে ঢুকতে হত সেই ঘরে। বাড়ির চারপাশে প্রকাণ্ড উঁচু দেয়াল তুলে দিয়েছিলেন বাবা। দিনের বেলা আমি যখন স্কুলে থাকতাম—অ্যান একা একা পায়চারি করত ওর ঘরের লাগোয়া ছোট্ট বাগানটায়। স্কুল থেকে ফিরেই আমার কাজ ছিল ওর কাছে গিয়ে বসা; আমার মুখে বাইরের জগতের গল্প একমনে শুনে যেত ও।

ওই সময় একদিন বিকেলে এক ভদ্রলোক এলেন আমাদের বাড়িতে। আমি তো রীতিমতো অবাক। বাবার কোনো বন্ধুবান্ধবকে কখনও বাড়িতে আসতে দেখিনি। বাবা-মা কোথাও যেতেন না বলেই আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীরাও কেউ আসত না। বহুকাল পর সেদিন আমাদের বাড়িতে বাইরের মানুষের পা

BanglaBook.org

পড়েছিল। নিজের পরিচয় দেওয়ার পর ভদ্রলোক জুয়েল অ্যানের একটা ছবি বের করে টেবিলের ওপর রাখলেন। দেখেই বুঝলাম—ও যখন ঘরের বাইরে ঘোরাফেরা করছিল তখন পাঁচিলের ওপার থেকে ওর অজান্তে ছবিটা কেউ তুলেছে। ওটা দেখেই বাবার মুখ কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল!

ভদ্রলোক কোনো এক কাগজের রিপোর্টার। অ্যানের ছবি তুলতে ওঁদের ফটোগ্রাফারকে যে কী কসরত করতে হয়েছে তা সবিস্তারে জানালেন। অ্যানের ইন্টারভিউ-এর ব্যাপারে বাবা মোটেই আগ্রহী ছিলেন না। ভদ্রলোক অনেক পীড়াপীড়ি করলেন, অ্যানের নামে একটা মোটা অঙ্কের চেক বাবার হাতে ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও করলেন, শেষ পর্যন্ত বিফল-মনোরথ হয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং টিকিট করে সাধারণ লোকজনের সামনে অ্যানকে হাজির করলে কী পরিমাণ আর্থিক লাভ হতে পারে—সে সম্পর্কে দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে বিদায় নিলেন। রাগে-উত্তেজনায় বাবার মুখ থমথম করছিল; নিজের ঘরে যাওয়ার আগে মাকে শুধু বললেন, দিনের বেলায় অ্যান যাতে ঘরের বাইরে না বেরয় সে ব্যাপারে নজর রাখতে।

রিপোর্টার ভদ্রলোক অ্যানের ইন্টারভিউ নিতে না পারলেও ওর ছবিটা কাগজে ছাপার ব্যবস্থা করেছিলেন। সেই সঙ্গে অ্যান সম্পর্কে দু-চারটে মনগড়া কথা! ওঁর লেখার শিরোনাম ছিল—'যে মেয়ের মাথা পাইন গাছকেও ছাড়িয়ে যায়!' বাবা তো বাড়িতে কোনো খবরের কাগজ আর না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। ফলে, পরবর্তীকালে অ্যান সম্পর্কে যা লেখালেখি হল তার কোনো খবরই আর পৌঁছাল না আমাদের কাছে।

খবরের কাগজে জুয়েল অ্যানের ছবি ছেপে বেরনোর পর প্রথম প্রথম বেশ কিছুদিন আমাদের অস্বস্তির মধ্যে কেটেছিল। প্রায় প্রতি রোববারই বেশ কিছু লোক এসে জড়ো হত আমাদের বাড়ির সামনে; গেট দিয়ে ভেতরে উঁকিঝুঁকি মারত তারা। ওদের মধ্যে সাহসী কেউ কেউ সরাসরি অ্যানের নাম ধরে ডাকাডাকি করত। সবচেয়ে বিরক্ত করত হাইস্কুলের ছেলেরা। ওরা অ্যানের নাম দিয়ে বিশ্রি সব রসিকতা করত, হাঃ হাঃ করে হাসত। গেটে তালা ঝুলিয়ে দরজা-জানলা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে বসে থাকা ছাড়া আমাদের কিছু করার ছিল না। ছেলেগুলোর হাবভাব দেখে আমার শুধু ডুয়ানের কথা মনে পড়ত। মাঝে মাঝে ভাবতাম, জুয়েল অ্যান যদি মেয়ে না হয়ে ছেলে হয়ে জন্মাত তবে হয়তো ওকে এতটা বিদ্রূপ সহ্য করতে হত না। মেয়েরা বেশি লম্বা হলেই কি ছেলেদের অহঙ্কারে ঘা লাগে?

BanglaBook.org

মা বাইরে বেরনো প্রায় বন্ধই করেছিল; সারাদিন ঘরের সমস্ত কাজ এক হাতে সামলাতে হত। অগত্যা, দোকান-বাজারের দিকটা আমিই দেখতাম। ঘরকন্নার যাবতীয় জিনিস তো বটেই, এমনকী সকলের পোশাক-আশাক কেনার দায়দায়িত্বও ছিল আমার ওপর। অ্যানের জন্য রেডিমেড পোশাক কেনার অবশ্য প্রশ্ন ওঠে না; আমি রঙিন কাপড়ের থান কিনে আনতাম; মা সেগুলি কেটেকুটে অ্যানের মাপমতো ফ্রক বানিয়ে দিত। একবার জিনস-এর প্যান্ট পরার শখ হল অ্যানের। আমি যখন দোকানে গিয়ে জিনস্-এর একটা গোটা থান চাইলাম—কাউন্টারের লোকগুলোর সব চোখ ছানাবড়া! মোটা আর ভারি কাপড়ের সেই পেল্লায় স্তূপ বাড়ি বয়ে আনাটাও সোজা কথা নয়। জিন্স্-এর সেই প্যান্ট বানাতে সেবার মাকে দারুণ পরিশ্রম করতে হয়েছিল। প্যান্ট পেয়ে অ্যান খুব খুশি; একবার পরলে আর ছাড়তেই চাইত না।

এর কিছুদিন পর আমি একটা চাকরি পেলাম। অ্যানের বয়স তখন পনের বছর; লম্বায় তখন ও পাক্কা পঁয়তাল্লিশ ফুট এবং বেড়ে যাওয়ার ব্যাপারে ইতি টানার লক্ষণ নেই। আমার অফিসটা বাড়ি থেকে বহুদূরে হওয়ায় ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যেত। তবুও প্রতি রাতে আমরা সবাই মিলে খানিকক্ষণের জন্য অ্যানের ঘরে গিয়ে বসতাম। বাবা আমার দিকে তাকিয়ে বলতেন, 'একটু পয়সা-কড়ি হলেই নির্জন কোনো সী-বীচ কিংবা ছোট্ট কোনো দ্বীপে গিয়ে বাস করব আমরা—কী বলিস? আমাদের জুয়েল-অ্যানও তখন খেয়াল খুশি মতো ঘুরে বেড়াতে পারবে চারদিকে।' অবশ্য আমরা তো সবাই জানতামই এমনকি অ্যানও জানত—সেটা কোনোদিন সম্ভব হবে না; তবু বাবার কথায় ওর সুন্দর চোখ দুটো উৎসাহে ঝকমক করে উঠত।

জুয়েল অ্যানের শরীরটা প্রকান্ড লম্বা হলেও ও কিন্তু আমার কিংবা মায়ের চেয়ে অনেক কম খেয়ে দিন কাটাত। ওর ওজন নেওয়া সম্ভব ছিল না; তা সম্ভব হলে হয়তো দেখা যেত—ওর আর আমার ওজনে তেমন ফারাক নেই!

ওর বয়স যখন বছর দশেক একবার 'অ্যালিস-ইন-ওয়ান্ডারল্যান্ড' বইটা বাড়িতে এনেছিলাম। বইটার এক জায়গায় আছে, কেমন করে বিশেষ একটা বোতলের পানীয় খাওয়ার পরেই অ্যালিসের শরীরটা বেলুনের মতন চুপসে গিয়েছিল! বই-এর ওই জায়গাটা বারবার আমায় পড়ে শোনাতে বলত অ্যান। একদিন ওকে 'গালিভার্স ট্রাভেলস্' এনে দিয়েছিলাম। লিলিপুট আর দৈত্যদের ঘটনাগুলি তেমন মনে ধরেনি ওর। নিজে নিজে বই পড়ার মতো অবস্থা অবশ্য ছিল না। ওর হাতে বইগুলোকে দেখাতো ডাকটিকিটের মতন! বাবা ওর জন্য এক ঢাউস টি-ভি কিনে দিয়েছিলেন। তেরো বছর বয়সের পর থেকেই ঘরের

BanglaBook.org

বাইরে আসাটা প্রায় বন্ধ হয়েছিল। ফলে, বাইরের দুনিয়া সম্পর্কে ধারণা করার জন্য ওই টিভি ছাড়া কিছুই ছিল না ওর।

জুয়েল অ্যানের ঘরের পরিসর যতটা সম্ভব বাড়ানো হয়েছিল, তা সত্ত্বেও ওকে সবসময় পা-মুড়ে শুয়ে বা বসে থাকতে হত। মাঝে মাঝে আমার মনে হত—গ্রামের দিকে আমাদের যদি নিদেনপক্ষে একটা খামার-বাড়িও থাকত, ওকে হয়তো সবসময় এমন বন্দি হয়ে থাকতে হত না। ওইরকম একটা খামার-বাড়ি কিনব বলে একসময় সত্যি সত্যিই আমি টাকা জমাতে শুরু করেছিলাম; এমনকী সন্ধের পর একটা পার্ট-টাইম কাজ জোগাড়ের কথাও ভেবেছিলাম। কোন্ অঞ্চলে জায়গা-জমি কেনা যায় তা নিয়ে অ্যান আর আমি প্রচুর জল্পনা-কল্পনা করতাম; ওর পক্ষে মানানসই চেয়ার-টেবিল বানাতে কত কাঠ লাগবে তার হিসেব করতাম। অবশ্য যত দিন যাচ্ছিল, অ্যানের কথাবার্তাও ক্রমশ কমে আসছিল। তাহলেও আমার সঙ্গ ও খুব পছন্দ করত। আমি যখন ঘরে গিয়ে ওর নরম তুলতুলে হাতের কাছে বসতাম। ও শুধু নরম দৃষ্টি দিয়ে আমায় দেখত; ওর ঠোঁটের কোণে হাসি চিক্‌চিক্ করত তখন। তারপর যেদিন ওর প্রিয় জিনস্-এর প্যান্টটা কিছুতেই আর পরতে পারল না—কী মন খারাপটাই না হল সেদিন! টিভি দেখা বন্ধ করল; প্রায় কিছু না খেয়েই দিন কাটাতে লাগল। প্রথম প্রথম আমি আর মা ওকে খাওয়ার জন্য জোরাজুরি করতাম; পরে দেখলাম, খাওয়া-দাওয়ার ইচ্ছেটাই ওর একেবারে চলে গেছে!

লম্বায় কিন্তু অ্যান এখনও বেড়ে চলছিল। ওর গোটা শরীরটাকে তখন একরাশ তুলোর মতো হাল্কা আর নরম বলে মনে হত। মা একদিন রান্নাঘরে কাপ-ডিশ ধুতে ধুতে বলল, 'ওর শরীরটা কেমন স্বচ্ছ হয়ে যাচ্ছে, দেখেছিস? যে দেয়ালটায় ও হেলান দিয়ে বসেছিল, ওর কাঁধ-গলার মধ্যে দিয়ে দিব্যি সেটাকে দেখতে পেলাম আজ!'

আমি বললাম, 'আমারও তাই মনে হয়েছে। খেয়াল করে দেখো—ওর শরীরের নিচে কার্পেটের কারুকাজগুলো স্পষ্ট দেখা যায়, অনেকটা যেমন বেলুন ফোলানোর পর তার ভেতর দিয়ে আবছাভাবে সব কিছু দেখতে পাওয়া যায়—ঠিক তেমনি!'

মনে আছে, মায়ের সঙ্গে সেদিন কথাবার্তার পর পা টিপে টিপে অ্যানের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। সত্যিই ওর শরীরটাকে একটা স্বচ্ছ বেলুনের মতো দেখাচ্ছিল।

এরও প্রায় মাসখানেক পর একদিন হঠাৎ ও আমায় বলল, 'জানো, আমি লম্বায় আর বাড়ছি না।'

ওর ঠোঁট দুটো নড়ছিল, হাতের আঙুলগুলো আমার মুখের ওপর বোলাচ্ছিল ও। আমি কিন্তু ওর হাতের কোনো চাপ অনুভব করছিলাম না। আমার শুধু

BanglaBook.org

মনে হচ্ছিল, খানিকটা উষ্ণ বাতাস বুঝি আমার চোখ মুখ ছুঁয়ে যাচ্ছে। ওর ঠোঁটের কোণে ভারি মিষ্টি এক টুকরো হাসি দেখেছিলাম সেদিন।

আমার কেন জানি না, খালি কান্না পাচ্ছিল। আমার দিকে ওর তাকানো, আমার মুখে হাত বোলানোর মধ্যে কেমন যেন একটা বিদায় নেওয়ার ভঙ্গি ছিল। ওর পাশে বসে থাকতে থাকতে, ওর ভালোবাসার স্পর্শ গায়ে মেখে ওই ঘরের মধ্যেই সেদিন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আমি।

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙতেই, জুয়েল অ্যানের শরীরটাকে যেন আবছা একটা পরদার মতো দেখেছিলাম। ওর নাম ধরে বার বার ডেকেও সেদিন সাড়া পাইনি। আমার আওয়াজ শুনে মা এসে পাশে দাঁড়িয়েছিল। তারপর চোখের জল মুছতে মুছতে আমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল ওখান থেকে।

সপ্তাহখানেক পর, মা একদিন ছলছল চোখে বলল, 'ও চলে গেছে।'

কথাটা শুনেই আমি ছুটে গিয়েছিলাম অ্যানের ঘরে। মেঝেয় ওর পোশাকটা টান-টান হয়ে পড়েছিল। আমার কিন্তু মনে হচ্ছিল—ও ঘরের মধ্যেই রয়েছে; শরীরটা আরও বড় আর হাল্কা হয়ে যাওয়ায় ওর অস্তিত্ব টের পাচ্ছি না আমরা।

মা ওর সেই ঘরটায় তালা লাগাতে চেয়েছিল, আমি বাধা দিয়ে নিজের খাটটা টেনে নিয়ে গিয়েছিলাম ওখানে। সেই থেকে এখনও আমি ওই ঘরেই আছি। মাঝে মাঝে রাত্রে ঘুম ভেঙে গেলে, গায়ে এক অদ্ভুত উষ্ণতার ছোঁয়া পাই। আমার ছোট বোনটা যে আমাদের ছেড়ে কোথাও যায়নি, ও যে সুন্দর চোখ দুটো দিয়ে আমায় দেখছে, আমার গালে-মাথায় হাত বুলোচ্ছে—তা দিব্যি টের পাই যখন।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

খুদে উদ্যোগ

উইলিয়াম লি

‘আমার ক্ষুদে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে একটা ‘উদ্যোগী-দল’ খুললে কেমন হয়? খেতে খেতে প্রশ্নটা ছুড়ে দিলাম আমার স্ত্রীর দিকে।

‘মন্দ হয় না,’ মার্জোরি মুচকি হেসে জবাব দিল, ‘তবে কিনা, উদ্যোগী-দল বলতে কী বোঝাচ্ছ সেটা জানা দরকার। তাছাড়া, কীভাবে এই আইডিয়া তোমার মাথায় এলো তাও যদি একটু বুঝিয়ে বলো।’

‘না, আইডিয়াটা আমার নিজের নয়।’ আমার অকপট স্বীকারোক্তি। ‘আমাদের স্কুলের প্রিন্সিপাল মিস্টার ম্যাক্‌করমিক আজ ঘরে ডেকে বললেন, নিচু ক্লাসের কয়েকটা ছেলেমেয়ে নাকি এ ধরনের একটা দল গড়তে চেয়েছে এবং আগামী গ্রীষ্মের ছুটিতে ওরা কিছু করতে চায়। ওরা নিজেরাই নাকি আমাকে ওদের গাইড হিসেবে পেতে চেয়েছে!’

পাঠকদের এবার আমার পরিচয়টা জানানো দরকার। আমার নাম ডোনাল্ড হেন্ডারসন, রিজভিল হাইস্কুলে অঙ্ক আর ফিজিক্স পড়াই। রিজভিল স্কুলের যথেষ্ট সুনাম আছে; বুদ্ধিমান-চৌকশ ছেলেমেয়ে ছাড়া এ স্কুলে ভর্তি হতে পারে না কেউ।

‘তা, তোমার উদ্যোগী-দল কী করবে—সেটা তো বললে না।’ পাঁউরুটিতে মাখন মাখাতে মাখাতে আমার দিকে আড়চোখে চায় মার্জোরি।

‘এই ধরো, ছুটির সময় যখন পড়াশুনোর তেমন চাপ নেই তখন ওরা হয়তো ‘কাপড়-কাচা সাবান’ কিংবা ‘মেঝে চকচকে করার পালিশ’ তৈরি করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিক্রি করল। এতে ব্যবসা সম্পর্কে একটা ধারণা গড়ে উঠবে ওদের মধ্যে। তাছাড়া, এভাবে কিছু টাকা-পয়সা রোজগার হলে ভবিষ্যতে পড়াশুনো চালাবার ব্যাপারেও খানিকটা সাহায্য হতে পারে।’

‘হায়, হায়—শেষ পর্যন্ত তোমার কাছ থেকে ব্যবসার তালিম নিতে হবে?’ মার্জোরি হোঃ হোঃ করে হেসে ওঠে। ‘আহা বেচারারা!’

‘হেসে নাও, যত পার হেসে নাও,’ আমি কপট রাগের ভঙ্গি করে বলি,

BanglaBook.org

'আমার ছেলেমেয়েরা যখন সত্যি সত্যি চুটিয়ে ব্যবসা করবে তখন তোমার চোখদুটো যে ছানাবড়া হবে তা এই বলে রাখলাম। জানো—মিস্টার ম্যাক্‌করমিক নিজের পকেট থেকে পঞ্চাশ ডলার দিয়েছেন? তারপর, মিস্টার উইলিস বলে যিনি আমাদের হিসেবপত্র রাখেন, তিনিও তাঁর বাড়ির লাগোয়া আউট-হাউসটা ছেড়ে দিয়েছেন আমাদের কারখানা বানানোর জন্য। ওঁর বাড়িটা অবশ্য শহরের একটু বাইরে, তবু বেশ নিরিবিলি জায়গা বলতে হবে। এই কদিন পরেই তো ছুটি শুরু হচ্ছে। তুমি দেখে নিও—আমরা সত্যি সত্যি কাজে নেমে পড়ি কিনা।'

আমার স্ত্রী খিক্‌খিক্ করে হেসে বলে, 'বেশ, বেশ, তুমি কত্ত বড় কাজের লোক, এবারে তার প্রমাণ পাব।'

সপ্তাহ তিনেক পরে বুধবারের এক সকাল। আমি বসে আছি আগাছা-ভর্তি বাগানের একটা গাছের গুঁড়ির ওপর। আমার সামনে একটা নড়বড়ে কাঠের টেবিল। টেবিলের ওপরে বসে আছে পাঁচটি ছেলেমেয়ে—আমাদের উদ্যোগী-দলের পাঁচ সদস্য। ডরিস এনরাইট, পিটার কোপ আর হিলারি ম্যাটল্যাক—ওদের তিনজনেরই বয়স দশ বছর। সাদা ফ্রক-পরা ডরিসকে দেখাচ্ছে ঠিক একটা ফুলপরীর মতন। পিটার আর হিলারি—দুজনেই রোগা প্যাঁকাটে, কিন্তু দুজনেরই চোখ দারুণ ধারালো! ওদের থেকে একটু দূরে বসে আছে মেরি ম্যাকক্রিডি আর টমি মিলার। ওরা পড়ে দু-ক্লাস উঁচুতে—বয়স বছর বারো। মেরি তো সবসময়েই হাসছে; ওর হাসিটাও যেন ছোঁয়াচে! টমি আবার ভীষণ ছটপটে; এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে থাকাটা ওর ধাতে নেই!

'ইয়ে, এটা আমাদের প্রথম মিটিং।' আমি ওদের সকলের ওপর চোখ বুলিয়ে বক্তব্য শুরু করি। 'এই ছুটির দিনগুলোতে আমাকে তোমাদের মাস্টারমশাই বলে না ভাবলেও চলবে। তোমরা যা কাজকর্ম করবে সে ব্যাপারে মাঝে মাঝে আমার পরামর্শ নিতে পারো; তোমাদের উদ্যোগগুলো লাভজনক হবে কিনা তা বলে দিতে পারি—তবে ওই পর্যন্তই। যা কিছু তৈরি করার তা তোমরাই করবে; লাভ যা হবে সেও তোমাদেরই।'

ছেলেমেয়েগুলি যে খুব মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনছে এমনটা মনে হল না। বললাম, 'এবার তাহলে কাজে নেমে পড়া যাক। তোমরা কে কী বানাতে চাও, বলতে পারো একে একে।'

'ব্রণ'র দাগ তোলার ওষুধ বানালে কেমন হয়? মানে, আমার নিজেরই গালভর্তি ব্রণ'র দাগ কিনা; ওই ওষুধের আমিই তাহলে প্রথম খদ্দের হতাম।' হাসি হাসি মুখে বলে ওঠে মেরি।

BanglaBook.org

মেয়েটি আমার সঙ্গে রসিকতা করছে কি না তা ভাবতে গিয়েই মনে পড়ল স্কুলের প্রিন্সিপাল মিস্টার ম্যাক্‌করমিকের কথাগুলো। ভদ্রলোক আমার পকেটে পঞ্চাশ ডলার গুঁজে দেওয়ার সময় বলেছিলেন, 'যে পাঁচটা ছেলেমেয়ে ওই উদ্যোগী-দলটা গড়তে চাইছে ওরা প্রত্যেকেই যাকে বলে অসাধারণ বুদ্ধিমান; আই-কিউ কারোরই একশো চল্লিশের নিচে নয়। ওদের দিয়ে আপনি হয়তো অনায়াসেই ভালো কোয়ালিটির সাবান কিম্বা নাট-বল্টুর মরচে তোলার জন্য নতুন ধরনের তেল বানাতে পারবেন.....।'

মেরির দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিতেই টমি বল-বিয়ারিং বানানোর প্রস্তাব দিল। ওর ধারণা—এ অঞ্চলের কলকারখানায় নাকি ওই বস্তুটির প্রচণ্ড চাহিদা রয়েছে।

বললাম, 'বল-বিয়ারিং বানাতে গেলে একটা হাইড্রলিক প্রেস চাই, যার দাম নিদেনপক্ষে হাজার দশেক ডলার। সুতরাং অন্য কিছু বানানোর কথা ভাবো!'

'তাহলে, ইলেকট্রনিক্সের নতুন কিছু।' পিটার দ্বিধা জড়ানো গলায় বলে ওঠে।

'নতুন ধরনের ডিটারজেন্ট সাবান বানালে কেমন হয়?' পিটারকে বাধা দিয়ে বলে ওঠে হিলারি। 'মানে, আমি বলছি এমন এক ডিটারজেন্টের কথা যা কিনা আমাদের এই রিজভিল-এর লোহা ভর্তি খর জলেও দেদার ফেনা তুলবে।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' আমি গলা-খাঁকারি দিই, 'তোমরা যেসব জিনিসের কথা বলছ সেগুলি এই মুহূর্তে বানানোর মতো জায়গা বা মূলধন আমাদের নেই। বলা যায় না, যদি আগামী দু-তিনটে গ্রীষ্মের ছুটিতে আমরা কাজ চালিয়ে যেতে পারি তবে হয়তো পরে একসময় তোমাদের ওইসব বল-বিয়ারিং, হাই-ফাই ইলেকট্রনিক্স কিম্বা নতুন ধরনের ওষুধ বা ডিটারজেন্ট পাউডার বানাতে পারব।'

'স্যার, যদি বলেন তো আমরা ওসব কারিগরি দিকে না গিয়ে ইঁদুরছানা উৎপাদনের ব্যাপারে উৎসাহ নিতে পারি।' ডরিস এতক্ষণে মুখ খোলে। 'এ কাজটা বেশ কিছুদিন ধরে বাড়িতে বসে আমি করে আসছি কিনা—'

'ইঁদুরের বাচ্চা? তুমি কি সংকর জাতের ইঁদুর বানিয়েছ নাকি?'

'নিশ্চয়ই।' স্বাভাবিক গলায় জবাব দেয় ডরিস। 'ইঁদুররা তো জানেনই, চটপট বড় হয় আর বাচ্চা দেয়। ইঁদুরের বাচ্চা, তার আবার বাচ্চা—এইভাবে আমার ইঁদুরগুলো এখন সতের-পুরুষে এসে ঠেকেছে!'

Banglabook.org

'ইঁদুরগুলি কী বেশ নাদুস-নুদুস? তাহলে অবশ্য ল্যাবরেটরিগুলি কিনতে পারে।' আমি কিঞ্চিৎ উৎসাহিত বোধ করি।

'না, না—ওগুলো ল্যাবরেটরিতে বসে কাটা-ছেঁড়া করার মতো জন্তু নয়!' ডরিস হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। 'আপনি আমার ইঁদুরগুলো দেখেননি বলেই ও কথাটা বলতে পারলেন। গায়ে ওদের লাল ডোরাকাটা দাগ; দেখলেই আপনার পুষতে ইচ্ছে করবে। জানেন, ওদের গায়ের ওই রং আর ডোরাকাটা দাগগুলো আনতে আমাকে বেশ কয়েক পুরুষ ধরে ওদের জিন পরিবর্তনের ব্যবস্থা করতে হয়েছে? ওগুলো সব দারুণ শখের জীব!'

'লাল ইঁদুরের তেমন চাহিদা আছে বলে আমার কিন্তু মনে হচ্ছে না,' আমি ইতস্তত করে বলি, 'তার চেয়ে বরং আফটারশেভ লোশন বানাও না। এর জন্য চাই সামান্য একটু অ্যালকোহল, একটু গ্লিসারিন, জল, কোনো একটা রাসায়নিক রং আর ভুরভুরে গন্ধওয়ালা সেন্ট। বোতলের মধ্যে বস্তুটি পুরে ছাপানো লেবেল লাগিয়ে দিলেই, ব্যস!'

'কীভাবে বিক্রি করা হবে ওটা?' টমি জানতে চায়।

'কেন, বাড়ি বাড়ি গিয়ে বেচতে অসুবিধে কোথায়?'

'উঁহু তার চেয়ে বরং এমন জিনিস বানানো যাক যা খদ্দেররা এসে সাধাসাধি করে নিয়ে যাবে।' টমি আমার প্রস্তাব এক ফুঁ-এ উড়িয়ে দেয়। 'আপনি তো আফটারশেভ-লোশনে রঙ্ মেশানোর কথা বলছিলেন; আচ্ছা, এমন রঙ্ বানালে হয় না—যা দিয়ে শরীরের রঙ্ বরাবরের জন্য তামাটে করে নেওয়া যায়? লোককে তখন পয়সা খরচ করে সমুদ্রতীরে গিয়ে রোদ্দুরে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতে হবে না।...'

মিস্টার উইলিসের বাড়ি থেকে ঝুড়িতে করে স্যান্ডউইচ আর আপেল আসে। লাঞ্চের এই বন্দোবস্ত আগে থেকেই করে রাখতে হয়েছে। স্যান্ডউইচে কামড় দিতে দিতে আমরা আমাদের নতুন কোম্পানির কী নাম দেওয়া যায় তা নিয়ে আলোচনা করলাম এবং বলা বাহুল্য, কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেল না।

শেষ পর্যন্ত ঘুড়ি বানানোর প্রস্তাব এলো মেরির কাছ থেকে। তাই শুনে পিটার বলল, 'নতুন ধরনের ঘুড়ি বানালে মন্দ হয় না। ধরা যাক, ঘুড়িটা হবে 'মোজা'র মতো দেখতে'—বলেই পিটার মাটির ওপরে কাঠি দিয়ে ঘুড়ির ডিজাইন আঁকল। ঘুড়ির নিচে একটা ফুটো রাখতে হবে—নাহলে ঘুড়ি উড়বে না।'

BanglaBook.org

ডরিস বলল, 'আমি না হয় রাত্রে বাড়িতে বসে ওই রকম একটা ঘুড়ি বানাব, কাল আমরা এখানে এসে পরীক্ষা করে দেখব—ঘুড়িটা ওড়ে কিনা।'

ভাবলাম—এইসব খুদে কারিগররা যা প্রাণে চায় করুক, পরে ওদের ভুলত্রুটিগুলো না হয় শুধরে দেওয়া যাবে।

রাত্রে খেতে বসে সারাদিনের আলাপ-আলোচনার কথাই ভাবছিলাম। ছেলেমেয়েগুলো যেসব জিনিস বানানোর প্রস্তাব দিয়েছে তা এই মুহূর্তে বানানো সম্ভব না হলেও—ওগুলোর মধ্যে যে অভিনবত্ব আছে সেটা মানতেই হয়। যেমন টমি একবার টুথপাউডারকে ট্যাবলেট হিসেবে তৈরি করার প্রস্তাব দিল। দাঁত ব্রাশ করার আগে ওইরকম একটা ট্যাবলেট মুখে পুরে নিলেই গোটা মুখটা ফেনায় ভরে যাবে। পিটার এমন একটা জিনিস তৈরির প্রস্তাব দিল যা একাধারে স্ক্রু এবং পেরেকের কাজ করতে পারে। হিলালির মতে—এমন এক ধরনের প্লাস্টিকের চাকতি বানালে হয়, যার ওপরে কালো রং বুলিয়ে শীতের দিনে বাড়ির সামনে রেখে দিলে তা সূর্যের তাপ শুষে নিয়ে নিচের বরফ গলিয়ে দেবে। শীতের দিনে যাদের বাড়ির সামনে বরফ জমে বেরনোর পথ থাকে না—তাদের আর গাঁইতি-বেলচা দিয়ে বরফ কাটার কষ্ট পোয়াতে হবে না।

পরের দিন সকালে মিস্টার উইলিসের বাগান বাড়িতে গিয়ে যখন আকাশে এক ঢাউস মোজাকে উড়তে দেখলাম—নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না! ঘুড়ির সরু প্রান্তে ত্যারছাভাবে ফুটোটা করা হয়েছে—ফলে, আকাশে ভেসে বেড়াতে অসুবিধে হচ্ছিল না ঘুড়িটার।

'টমিকে দেখছি না যে?' ডরিসকে জিজ্ঞাসা করি।

'ও গেছে ব্যাঙ্কে। ব্যবসার মূলধন তো দরকার। তা এই ধরনের কয়েকশো ঘুড়ি বানাতে তো শ-খানেক ডলারের ধাক্কা!'

'ব্যাঙ্ক কেন? আমি আর মিস্টার ম্যাককরমিক তো তোমাদের কিছু টাকা ধার দিতে পারি—গতকালই তো বলেছিলাম সেটা।'

'আপনার কি মনে হয় না, ব্যাঙ্ক থেকে ধার করাটাই বেশি যুক্তিসঙ্গত? ব্যবসার জন্য সকলে তো ব্যাঙ্ক থেকেই ধার নিয়ে থাকে।'

ডরিসের কথা শেষ হতে না হতেই টমি হন্তদন্ত হয়ে ফিরে আসে। আমার হাতে একটা চেকবই গুঁজে দিয়ে বলে, 'আড়াইশো ডলার পাওয়া গেল। আপনি তো গতকাল আমাদের কোনো প্রস্তাবেই সায় দিলেন না—অথচ ব্যাঙ্কের লোকগুলো মোজা-ঘুড়ি আর ডিটারজেন্ট বানানোর পরিকল্পনায় কত উৎসাহ দেখাল! ধার

BanglaBook.org

পেতেও কোনো অসুবিধে হয়নি। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টটা অবশ্য আপনারই নামে। ফেরার পথে একবার ব্যাঙ্কে গিয়ে আপনার নমুনা সইটা দিয়ে আসবেন।'

আমার বুকের ভেতর কে যেন হাতুড়ি পেটাচ্ছে! আড়াইশো ডলার হল আমার পনের দিনের মাইনে। ওদের পরিকল্পনা যদি ব্যর্থ হয় তবে তার মাশুল গুণতে হবে আমাকেই।

'ও হ্যাঁ,' টমি কতগুলো ঝকঝকে লেখার প্যাড আর সাদা খাম এগিয়ে দিয়ে বলে, 'আমাদের কোম্পানির লেটারহেড বানাতে হবে। আমাদের এটার নাম দেওয়া যাক, 'রিজ ইন্ডাস্ট্রিজ'— কী বলেন? জায়গাটার নামই রিজভিল।'

কাগজের প্যাড আর খামগুলো হাতে নিয়ে বলি, 'বেশ দামি কালিতে ছাপাতে হবে তো?'

'নিশ্চয়ই।' ওরা সমস্বরে বলে ওঠে। 'ব্যবসা বলে যখন কথা—'

আমাদের ঘুড়ির কারখানা চালু হলো শুক্রবার সকালে। ছেলেমেয়েরা নিজেদের মধ্যে কাজের দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নিল। বেলা বাড়তেই দেখি—ওদের একজন কাঠের টুকরোগুলো থেকে চোক্‌লা বের করছে। কেউ আবার ওগুলো রজন-এ ডুবিয়ে শক্ত করে তুলছে। প্লাস্টিকের ফিল্মগুলিকে নানা আকারে কাটা হচ্ছে কাঁচি দিয়ে। ঘুড়ির ফ্রেমে কাগজ সাঁটছে একজন; সিমেন্ট দিয়ে ঘুড়ির কোণগুলিকে সেঁটে দিচ্ছে আর একজন—

পরের বুধবার সকালের মধ্যেই তিনশো ঘুড়ি তৈরি হয়ে গেল। সবাই মিলে টমিকেই বিক্রিবাটার দায়িত্ব দিয়েছে এবং টমির বিশ্বাস—বাজারের চাহিদা মেটানোর মতো যথেষ্ট সংখ্যায় মজুত না হলে কোনো জিনিসই বিক্রির জন্য বাজারে ছাড়া উচিত নয়। ঘুড়ির সংখ্যা তিনশোয় দাঁড়াতে টমিকে বেশ সন্তুষ্ট দেখলাম। আগামী সপ্তাহের মধ্যেই ঘুড়িগুলোকে বাজারে ছাড়ার কথা ও জানিয়ে দিল মেরিকে।

ওইদিন আরও তিনটে ঘটনা ঘটল, যার মধ্যে দুটোর আমি প্রত্যক্ষদর্শী। মেরি সেদিনই ওর বাড়ি থেকে একটা পোর্টেবল্ টাইপরাইটার নিয়ে এসেছিল; হঠাৎ বেশ কিছু চিঠিপত্র ঝপাঝপ্ টাইপ করে আমাকে একেবারে তাক লাগিয়ে দিল!

হিলারিও সেদিন আমাকে ওর নতুন তৈরি ডিটারজেন্ট দেখাল। বোতল থেকে হলদে রঙ-এর তরলের এক ফোঁটা বালতি-ভর্তি জলে ঢালতেই ফেনা উপচে পড়ল চারদিকে। আমাদের রিজভিলের জলে যেখানে সাবান ঘষে ঘষে হাত

BanglaBook.org

ব্যথা হয়ে গেলেও ফেনা তোলা যায় না, সেখানে এই নতুন ডিটারজেন্টের কেরামতি দেখে আমি তো হাঁ!

'কী দিয়ে বানালে এটা? কই আগে তো বলোনি, তুমি এসব বানাচ্ছ?'

'ওহ্, আপনি ফর্মুলাটা জানতে চাইছেন?' হিলারি আমার দিকে চেয়ে মুচকি হাসে। লরিল-বেনজিন-ফসফোনিক অ্যাসিড, ডাই-পটাসিয়াম সল্টের কুড়ি পার্সেন্ট সল্যুশন মিশিয়ে—'

'ব্যস, ব্যস।' আমি ওকে থামাই। কেমিস্ট্রির বই আমি শেষ উল্টেছি পঁচিশ বছর আগে।

বুধবারের তৃতীয় ঘটনাটা আমার কানে এলো বৃহস্পতিবার সকালে। আমাদের নতুন কারখানায় পৌঁছতে সেদিন আমার একটু দেরিই হয়ে গেছিল। দূর থেকেই দেখলাম—নিস্তব্ধ বাগানবাড়িটার চারপাশ একেবারে লোকে লোকারণ্য! আধমাইল দূর থেকে রাস্তায় সব গাড়ি দাঁড়িয়ে। কাছে যেতে দুজন পুলিশও নজরে এলো।

'কী ব্যাপার? এখানে এত ভিড় কীসের?' পুলিশ দুজনকেই যথাসম্ভব গাম্ভীর্যের সঙ্গে প্রশ্ন করি।

'আপনার নাম কি হেন্ডারসন?' ওদের একজন জানতে চাইল।

আমি সম্মতি জানাতেই একেবারে হইচই করে উঠল সকলে।

'আমি মশাই, কাগজের রিপোর্টার'—বলতে বলতে একটা রোগা-প্যাংলা লোক আশপাশের সবাইকে কনুই-এর গুঁতো দিয়ে হটিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। 'এখানকার ব্যাপার স্যাপারগুলো একটু খুলে বলতে কি কোনো অসুবিধে আছে আপনার?'

'এখানকার ব্যাপার স্যাপার? কী বলছেন, আমি তো মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'ওহ্, আপনি তাহলে জানেন না যে আপনার এক ছাত্র শহরের সবচেয়ে বড় ফোয়ারাটার জলে সাবানের গুঁড়ো ফেলে এসেছে গতকাল?'

'না, জানি না।' আমার বেশ বিরক্ত লাগে। 'আর যদি ফেলেও থাকে তাতে হয়েছেই বা কী?'

'বলেন কী?' একজন মোটাসোটা চেহারার বুড়ি হোঃ হোঃ করে হেসে ওঠেন। 'হবার কি কিছু বাকি আছে? সাবানের ফেনা ফোয়ারার বাঁধানো দেয়াল উপচে শহরের সব রাস্তাগুলিকে ভাসিয়েছে!'

'রাস্তায় রাস্তায় এখন গাড়ির জ্যাম; আর সে ফেনারও যেন শেষ নেই!'

BanglaBook.org

পুলিশদের একজন চেঁচিয়ে ওঠে। 'আমাদের থানায় ভোরে একজন ফোনে জানাল—আপনার এখানে টমী মিলার নামে একটা ছেলে নাকি ওই ডিটারজেন্ট বিক্রি করছে। আমরা তো মশাই এখানে এসে আপনার ছেলেমেয়েদের আজব ঘুড়ি দেখে আরও বেশি তাজ্জব বনে গেছি।'

'আর ইঁদুরটাও কি ফ্যালনা নাকি?' একটা কমবয়সী মেয়ে কলকলিয়ে ওঠে। 'ইঁদুরের গায়ে যে ডোরাকাটা দাগ হয়, আর কাঠবিড়ালির মতো লেজ—কেউ কী দেখেছে কখনও?'

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে অবশ্য ভিড় পাতলা হয়ে এল। পুলিশ দুজন যাওয়ার সময় শাসিয়ে গেল, 'যা করছেন করুন, কিন্তু আপনাদের ওই আবিষ্কারের ফলে যদি শহরে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তখন ফল ভুগতে হবে আপনাকেই?'

'স্যার, রিপোর্টার লোকটা কী বলে গেছে জানেন?'

টমিকে উচ্ছ্বাসে ডগমগ দেখায়। 'আমাদের সব কীর্তিকলাপ নাকি ফলাও করে ছাপা হবে কাগজে। উহ্, সত্যি এখন আমাদের হাতে হাজার কয়েক ঘুড়ি থাকলে কত লাভ হত বলুন তো? ডরিস, তোর কাছে কতগুলো ইঁদুর আছে!'

আবার সেই ইঁদুর! নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারি না। ইঁদুরের জিন্-কে ওলট-পালট করে কী আজব লেজ-ই না বানিয়েছে ওই ছোট্ট মেয়েটা!

'অসংখ্য বাচ্চা দিচ্ছে ইঁদুরগুলো।' ডরিসও আহ্লাদে আটখানা। 'মুশকিল হল—আমাদের বাড়িতে আবার এতো ইঁদুর রাখার জায়গা নেই।'

'একটুও চিন্তা করিস না।' টমি অভয় দেয়। 'হই হই করে সব বিক্রি হয়ে যাবে দেখিস। তোর ওই ইঁদুর কেনার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যাবে।'

বস্তুত খবরের কাগজে ঘুড়ি আর ইঁদুরের ছবি ছেপে বেরনোর পর ক্রেতাদের ভিড় লেগে গেল আমাদের ওখানে। টমি এদিকে খুচরো বিক্রির বিপক্ষে। প্রত্যেকটা ইঁদুরের ও পাইকারি দাম রাখল দশ ডলার।

ইতিমধ্যে আমাদের নতুন চেয়ার-টেবিল এসেছে। আউট-হাউসটাকে এখন দিব্যি অফিস ঘরের মতো দেখায়। দিন কয়েক পর ওই অফিসঘরে বসেই চিঠির খসড়া বানাচ্ছি—একজন ফিটফাট যুবক ঢুকল ঘরে। মাথা থেকে টুপিটা নামিয়ে বলল, 'আপনি নিশ্চয়ই ডোনাল্ড হেন্ডারসন। আমি আসছি পেটেন্ট অফিস থেকে। আপনার ছেলেমেয়েরা যেসব জিনিস বানিয়েছে সেগুলো যাতে অন্যেরা নকল করে নিজেদের বলে চালাতে না পারে তার জন্য ওগুলো পেটেন্ট নিতে হয়। এক একটা আবিষ্কার পেটেন্ট করাতে খরচ মাত্র ষাট ডলার।'

BanglaBook.org

টমি তো সঙ্গে সঙ্গে রাজি। পেটেন্ট অফিসের ভদ্রলোক সঙ্গে করে ফর্ম এনেছিলেন। উদ্যোগী-দলের ছেলেমেয়েদের হয়ে সই-সাবুদ সব আমাকেই অবশ্য করতে হল।

পরের দিনই আমাদের সেলস-ম্যানেজার টমি—ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক আর লস্ এঞ্জেল্স্-এর খেলনার দোকানগুলোয় ঘুড়ির একটা করে নমুনা পাঠাল—সঙ্গে অর্ডার ফর্ম। এক একটা ঘুড়ির দাম যে দেড় ডলার এবং প্রতিটি অর্ডারের সঙ্গে যে এক হাজার ডলার অগ্রিম পাঠাতে হবে সে কথাটা লিখে দিতেও ভুলল না।

সপ্তাহ তিনেক পরের ঘটনা। বাইরে ঝিরঝির বৃষ্টি পড়ছে। মার্জোরি কফির কাপটা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'তোমাকে বেশ খুশি খুশি দেখাচ্ছে আজ। কী ব্যাপার?'

বললাম, 'হিলারির তৈরি ডিটারজেন্ট আর টমীর 'বিফোর-শেভ লোশন'-এর পেটেন্ট ছাড়পত্র পেয়ে গেছে।'

'বিফোর-শেভ লোশন?' মার্জোরি ভুরু কুঁচকে তাকায়।

'আরে, দাড়ি কামানের আগে মুখে ওই লোশনটা একবার মেখে নিলেই হল। দাড়ির ডগাগুলো গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ভেঙে পড়ে। ব্লেডের কোম্পানিগুলো সব এবারে ডকে উঠল বলে!'

'বলো কী? পরের দিন সকালে আবার দাড়ি গজাবে তো?'

'নিশ্চয়ই। কেউ কী আর দাড়ি-গোঁফ জন্মের মতো বিসর্জন দিয়ে মাকুন্দ বনতে চায়?'

'কিভাবে জিনিসটা বানায় বল তো।' মার্জোরি জানতে চায়।

'একেবারে সাধারণ কেমিস্ট্রির ব্যাপার।' আমি তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলি। 'টমি তো বলছিল—কিস্টিল-থায়ো-ল্যাকটোন না কী যেন নাম ওটার—তার সঙ্গে ম্যাগনেশিয়ামের এক যৌগ মেশালেই লোশনটা তৈরি হয়ে যায়।'

'তা ওদের ব্যবসা এবারে জমবে বলো?' মার্জোরিকে বেশ উৎফুল্ল দেখায়।

'নিশ্চয়ই। টমি তো আজ আবার ব্যাঙ্কে গেছিল ধারের জন্য। হাইড্রলিক প্রেস কিনতে হাজার বিশেক ডলার চাই। বল-বিয়ারিং বানানোর কী যে খেয়াল চেপেছে ওর মাথায়! এই তো বর্ষাটা কাটলেই আমাদের আরও সব জিনিস তৈরির কাজ পুরোদমে শুরু হয়ে যাবে।'

'বলো কী? তখন তো স্কুল খোলা থাকবে—পড়াশুনোর চাপ—'

BanglaBook.org

'পড়াশুনোর আবার চাপ কী? সপ্তাহে ঘণ্টাখানেক পড়লেই ওদের পরীক্ষার পড়াটা তৈরি হয়ে যাবে। শনি-রবিবার ওদের কাজটা কী?'

'না, না, তাই বলে বাচ্চাদের দিয়ে খাটানোটা ভারি অন্যায়।' মার্জোরি খুঁতখুঁত করতে থাকে। 'আঠারো বছরের নিচের ছেলেমেয়েদের দিয়ে কারখানায় কাজ করানোটা বেআইনি।'

'ধ্যাৎ, ওদের দিয়ে কাজ করানোর কথা উঠছে কেন?' আমি বোঝানোর চেষ্টা করি। 'আসলে, ওরাই তো কারখানার মালিক। আপাতত আমি হলাম কারখানার প্রথম মাইনে করা কর্মচারী। তা, মাইনেপত্র নেহাত মন্দ মিলবে না, বুঝলে?'

মার্জোরি হাঁ করে চেয়ে থাকে আমার দিকে।

- সমাপ্ত -

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org